Vol. 43 | No. 3 | 2000

Check for updates


# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


## আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প


| | |
|---|---|
| Volume | 43 |
| Issue | 3 |
| Year | 2000 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মিজানুর রহমান |
| Published online | June 1, 2000 |
| DOI | 10.62328/sp.v43i3.409 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v43i3.409 |
| Pages | ৩১-৫৫ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪০৭ ॥ জুন ২০০০ (প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০১)

Check for updates

# আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

মিজানুর রহমান*

বাংলা ছোটগল্পকে যে কজন গল্পকার সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তাঁদের অন্যতম। এন্টি রোম্যান্টিক এ কথাশিল্পী অত্যন্ত সার্থকতার সাথে তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন পুরনো ঢাকার ক্ষয়িষ্ণু চিত্র। অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন ঢাকার সমাজ, জীবন ও মানুষের কাহিনী। বর্ণনা অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি অধিক মনোযোগী থেকেছেন ছোটগল্পে। সমগ্র জীবনব্যবস্থার চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি তুলে আনতে সক্ষম। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গল্প লিখেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। শুধু মানুষের মুখের ভাষা শুনে সে চরিত্রকে যে কত সুন্দরভাবে চেনা যায় তা বোঝা যাবে ইলিয়াসের গল্প পড়লে। বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে এই গল্পকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বারবার। তাঁর এই পরীক্ষাধর্মী লেখা সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য :

> আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রকরণ–পরিচর্যায় নিরীক্ষাপ্রিয় শিল্পী। এন্টি রোমান্টিক দৃষ্টিকোণে প্রাত্যহিক ভাষায় তিনি নির্মাণ করেন যাপিত জীবনের চালচিত্র। পুরনো ঢাকার ভাষা কুট্টিদের খিস্তি খেউড় আর বাখরখানি সংস্কৃতি ইলিয়াসের গল্পে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত যেন। তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন দীর্ঘ বাক্য গঠনে; 'এই দীর্ঘ বাক্যপাঠে অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে তাঁর গদ্য বিরক্তিকর হলেও সজ্ঞান হৃদয়সংবেদী পাঠক গল্পের ভেতরে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হন না।'[১] ফ্লাশ ব্যাক পদ্ধতিতে কাহিনী বয়ন ইলিয়াসের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২]

ইলিয়াসের গল্পে যেন তদন্ত করা হয়েছে এক একটা চরিত্রকে। আর এই তদন্তকারী অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সময় ব্যয় করে তারপর চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন পাঠকের সামনে। প্রবঞ্চক শহর কীভাবে গ্রাম থেকে আসা মানুষের সাথে প্রতারণা করছে, সে চিত্রও পাওয়া যায় ইলিয়াসের গল্পে। বাস্তবতা দিয়েই তিনি প্রায় তাঁর সব গল্পের শরীর গেঁথেছেন। ফলে–

> শ্মশানের মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে চণ্ডালের যে অবস্থা ইলিয়াসেরও তাই। সবক'টি চশমা খুলে বসে আছেন অথচ আমাদের সাহিত্যে চশমার তো অন্ত নেই– কোঁৎ কোঁৎ আবেগের চশমা, ধর্মের সম্প্রদায়ের রঙিন চশমা কতো আছে। ইলিয়াসের খোলা চোখের দৃষ্টি সমকালীনতার মূলটুকু দেখে নেয়, দাঁত নখ সবই বাজপাখির মতো তড়িঘড়ি ও সোজাসুজি, আর ঠিক সেটুকুই তিনি লিখতে বসে যান। এই জন্যেই তাঁর লেখায় হাবাগঙ্গারামদের প্রেম নেই। দাম্পত্য জীবন, প্রেম প্রীতি, পিতৃভক্তি, বাৎসল্য ইত্যাদির উপর তিনি যেন বাজ ফেলেছেন।[৩]

---

* প্রভাষক, বাংলা, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ।

এ পর্যন্ত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কয়েকটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬), *খোঁয়ারি* (১৯৮২), *দুধভাতে উৎপাত* (১৯৮৩) *দোজখের ওম* (১৯৮৯) *জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭)।

ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর*। মোট গল্পের সংখ্যা ছয়। এগুলো হলো: 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'উৎসব', 'প্রতিশোধ', 'যোগাযোগ', 'ফেরারি' ও 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় নানা মহলে। বইখানি সম্পর্কে বাংলা কথাসাহিত্যের একজন শক্তিশালী লেখক হাসান আজিজুল হকের (জ. ১৯৩৯) মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য–

> 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' এর মতো বই, বাংলাদেশের গল্প সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য একটি বই. বাংলা ভাষার গদ্যের ক্ষেত্রেও বটে। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' তীরের মত ঋজু, ধানীলংকার মত বদমেজাজি এবং পরনারীর মতো আকর্ষণীয়। এই বইয়ের গদ্য শুকনো খটখটে, প্রায় সবটাই ডাঙা, ডাঙার উপরে কচি নরম সবুজ গাছপালা জন্মেছে এমনও মনে হয় না। কোথাও একটু দয়া নেই, জল দাঁড়ায় না– বাস্তব ঠিক যেমনটি, তেমনি আঁকা, ক্যামেরাও এর চেয়ে নিখুঁত ছবি তুলতে পারে না।[৪]

*অন্য ঘরে অন্য স্বর* গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। বাস্তবতা দিয়ে এ গল্পের ভিত্তি রচনা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে গেছে বাস্তবাতিরিক্ত। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী কলাকৌশলে গল্পটিকে যে রূপ দেওয়া হয়েছে তাতে বলা যায়, এটি ইলিয়াসের আত্মভাবনার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ। গল্পে আত্মমগ্নতার জন্য প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে, এসেছে রবীন্দ্র সংগীতের সুরমূর্ছনায় অবগাহন করার কথা। কিন্তু জীবন যন্ত্রণায় ঘা খাওয়া রঞ্জু যখন অস্থির, তখন–

> ম্লানআলো বাল্বের অইটুকু ছায়ায় রঞ্জু দেখতে পেল নিশ্চিন্তপুরের সময়-কাঁদা, নির্লিপ্ত মাঠে দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। ছোট ছোট ছায়া ফেলে দুর্গার সঙ্গে রঞ্জু রেললাইন দেখতে কতদূরে পাড়ি দিচ্ছে। দুর্গা সিঁদুরের কৌটা চুরি করে তাকের উপর লুকিয়ে রেখেছিল বলে এক ধরনের অনুতপ্ত বিষাদ বোধ করল। 'দিদি তুই সিঁদুরের কৌটা চুরি করলি কেন?' (*অন্য ঘরে অন্য স্বর,* ১৯৭৬, পৃ. ১৫-১৬)

রঞ্জুর মন পরিচিত পৃথিবীর আচার-আচরণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না সব সময়। সে কারণে তা যেন বিচরণ করে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। এ গল্পে বাস্তব ও পরাবাস্তব হাত ধরাধরি করে চলে। রাতের নির্জন প্রহরে রঞ্জু গামবুট ও রেইনকোট পরা পুলিশ কনস্টেবলকে পথের পাঁচালির দুর্গার এক অস্বাভাবিক রূপে দেখতে পায়। পরাবাস্তবের মুখে দাঁড়িয়ে রঞ্জু বাস্তবের মুখে দাঁড়ানো পুলিশের অনেক কথা শোনে।

লেখক চমৎকার একটা শিল্পভাবনা তুলে ধরেছেন গল্পটির মধ্যে। শান্তি-সন্ধানী মানুষ নিয়তই সিক্ত অতৃপ্তির জারক রসে। রঞ্জুর মতো সবারই মনোভাবনার একটা ব্যঞ্জনা লেখক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। একজন সমালোচক এ গল্পটিকে জীবনানন্দের পরাবাস্তব ভাবনার সাথে তুলনা করেছেন। সমালোচকের মন্তব্য :

> জীবনানন্দ দাশের পরাবাস্তব ভাবনার সাথে ইলিয়াসের শিল্প চৈতন্যের যেন এক চমৎকার সেতুবন্ধন ঘটেছে এই গল্পে। হাজার বছর ধরে পথ হেঁটেও কবি তাঁর বাস্তব জীবনে বনলতা সেনকে খুঁজে পাননি, কেননা বিদর্ভ নগরে বনলতার জন্ম, সে বিদর্ভ নগর অতীতের অন্ধকার-গর্ভে বিলীন হয়ে

গেছে। যদিও কবির মানস প্রতিমা বনলতা সেন, কিন্তু বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে তার অধিষ্ঠান হওয়ায় তাকে পাওয়াও বেশ কঠিন। হাজার বছরের ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে বনলতা সেনকে না পাওয়ার এই বেদনা তখনই কবির দূর হয়, যখন কল্পনায় তিনি তার মুখোমুখী বসেন। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রঞ্জুও তার এক কালের প্রিয় খেলার মাঠটিকে হারিয়ে ফেলে, সেই সঙ্গে হারায় আরো অনেক কিছুকে। সে জানে না কেমন করে হারাল সেই মাঠ।[৫]

সমালোচকের উক্তি যথার্থ। কেননা কবি যেমনভাবে বনলতা সেনকে খুঁজে ফেরেন, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রঞ্জুও তার ফেলে আসা জীবনের সেই অনুভবের মাঠটাকে সন্ধান করে।

গোটা নগর জীবনের একটা পরিপূর্ণ চিত্র উঠে এসেছে ইলিয়াসের 'উৎসব' গল্পটিতে। পুরনো ঢাকা এবং নতুন ঢাকার চালচিত্র তুলে ধরতে গল্পকার কয়েকটি দৃশ্যপট, চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন গল্পটির মধ্যে। অতঃপর চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন বাস্তবতার নিরিখে। অত্যন্ত চমৎকারভাবেই এ গল্পে ইলিয়াস জীবনের কাছাকাছি অবস্থান করে জীবনকে দেখেছেন।

পুরনো ঢাকার আনোয়ার আলী ধানমণ্ডির এক অভিজাত বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ পায় বৌভাতের। এ নিমন্ত্রণে আনোয়ার আলী খুশি হয়। কারণ বড়লোক বন্ধুর বাড়িতে গেলে অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। এবং তা সে পেয়েও যায়। চকচকে অনেক উৎকৃষ্ট জাতের মেয়ে দেখতে পায় সে, ভাল ভাল খাবার পায়, কুলীন সম্প্রদায়ের কথাবার্তাও শোনে। এ সব কিছু তার কাছে অভিনব মনে হয়। এমনকি বিয়ে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটাকেও তার মনে হয় অভিজাত একটা প্রাণী। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে পুরনো ঢাকার শরীর ভরা ঘা লোমহীন দগদগে শরীরের, মেরুদণ্ডহীন, কুঁই কুঁই করা, ডাস্টবিনের পচাগলা খাওয়া, ল্যাম্পোস্টে ছির ছির কর 'পেচ্ছাব' করা ভাবলেশহীন কুকুরের কথা। একই সাথে তার মনে পড়ে নিজের স্ত্রী সালেহার কথা। সালেহার হলুদ বর্ণের সাদা দাঁত, শাড়ির ভেতরের কোল বালিশ সদৃশ বুক, পাছাহীন একটা দেহ। এসব কথা মনে উঠতে আনোয়ার আলীর গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। এমনকি স্ত্রী সালেহার রাতের বেলায় কলতলায় গিয়ে দুটো ইটে ধ্যাবড়া পা রেখে যে গ্যালন গ্যালন পেচ্ছাব করা, তা মনে উঠতে আনোয়ার আলীর মনে হয় পৃথিবীতে হাজারো সুন্দরের মাঝে শুধু তার ঘরে যত সব অসুন্দরের উৎপাত।

আনোয়ার আলীর বন্ধু কাইয়ুম তাকে নিমন্ত্রণ করে ভালই করেছে; তা না হলে আনোয়ার আলী অনেক সুখকর অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতো। বিয়ে বাড়িতে তাদের এককালের কলেজ পড়ুয়া বন্ধু হাফেজকে দেখা যায়। হাফেজ এখন কলেজে অধ্যাপনা করে। সুযোগ পেয়ে সে বিয়ে বাড়িতে আত্মজীবনী শুরু করে দেয়। এসব নানারকম দৃশ্য উপভোগ করে রাতে যখন সালেহার সঙ্গসুখ নিতে যায় আনোয়ার আলী তখন আর তা ভাল লাগে না তার। রতিক্রিয়ার আগে অন্তত মিনিট বিশেক ভালবাসতে হবে এই ধ্যাবড়া মহিলাটিকে, একথা ভেবে প্রথমে তার কষ্ট হয়। অতঃপর সালেহাকে উপলক্ষ করে বিয়ে বাড়িতে দেখে আসা নারীরা তার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তবুও তার যৌনচেতনা তেমন সক্রিয় হয় না, এ রকম সময়ে রাস্তায় হৈ হুল্লোড় শুনে সে বেরিয়ে আসে, আর দেখে সিনেমা হলের শো ভাঙা জনতা মজা করে দু কুকুরের রতিক্রিয়া দেখছে।

> একটা কুকুরের গায়ে এসে পড়ল ইটের ছোট একটি টুকরো। দম্পতি লজ্জা কিংবা ভয়ে, অথবা লজ্জা এবং ভয়ে একটু একটু সরতে থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া ওদের পক্ষে অসম্ভব। কিংবা সে রকম ইচ্ছাও বোধ হয় ওদের নেই। (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*, ১৯৭৬, পৃ. ৩৪)

অতঃপর আনোয়ার আলী ঘরে ফিরে সালেহাকে কাছে টেনে নেয়। কুকুরের রতিক্রিয়া দেখে আনোয়ার আলীর যৌনস্পৃহা জাগার মধ্যে যে দৃশ্যপট নির্মাণ করেছেন লেখক, তা শিল্পসম্মত হয়েছে। সাথে সাথে নগর জীবনের দৃশ্যপট যেভাবে তিনি উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে অল্প পরিসরে ফুটে উঠেছে মহানগরীর একদিকের ক্ষয়িষ্ণু চিত্র অন্যদিকে বিত্তবানদের কৃত্রিম চাকচিক্য। গল্পে লেখকের জীবনবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অকৃত্রিম ও বাস্তবতামণ্ডিত।

মধ্যবিত্তের প্রতিশোধস্পৃহা কীভাবে গুমরে মরে অন্তরে তার জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সরল বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে 'প্রতিশোধ' গল্পে। ছা-পোষা কর্মচারী ওসমান চাকুরি করে আশুগঞ্জে। 'ফাদার সিরিয়াস কাম শার্প' টেলিগ্রাম পেয়ে সে ছুটে যায় ঢাকায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী কতটা সিদ্ধান্তহীনতার নাগর দোলায় দোল খেতে পারে আর কী পরিমাণ আপসকামী হতে পারে তা লেখক দেখিয়েছেন এই গল্পে। বাড়ির টেলিগ্রাম পাওয়ার পর ওসমান ইচ্ছা করলে ১০/১২ দিনের ছুটি নিতে পারতো। কিন্তু সে অনিশ্চয়তার দোলনায় দোল খায়, যদি তার পিতার মৃত্যু না হয় তাহলে অহেতুক ছুটিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। সেকারণে ১০/১২ দিনের পরিবর্তে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সে উঠে পড়ে ট্রেনে।

বাড়িতে যাওয়ার পর অসুস্থ পিতা আবদুল গনির শয্যাপাশে দেখা যায় ওসমানের মৃত বোনের স্বামী আবুল হাশেম ও তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নার্গিসকে। নার্গিসের সাথে ওসমানের বিয়ে হওয়ার একটা কথা ও সম্ভাবনা ছিল। সে কারণে নার্গিসকে দেখে ওসমানের 'বুকের লোম শিরশির করে ওঠে'। তাই তো সে মনোযোগী হয় ডানদিকের পাকা তিনটে চুল উপড়াতে। এ কারণে পুরো চারটে মিনিট দিতে হয় বিসর্জন। অন্যদিকে বোনের হত্যাকারী আবুল হাশেমকে দেখে সে ফুঁসতে থাকে নিদারুণ আক্রোশে।

আবদুল গনি ও আবুল হাশেমের কথোপকথনের মধ্যে বেরিয়ে আসে সুবিধা ভোগকারী আবুল হাশেমের পরিচয় :

> আবদুল গনি বড়ো উত্তেজিত, 'বাজে কথা বলো না'; সে কেবল আবুল হাশেমের দিকে তাকিয়েই কথা বলে, 'হেয়ার স্ট্রিটের বাড়ি আমার দরকার। এরা দুই ভাই বিয়ে-শাদি করলে কি একসঙ্গে থাকবে? আমি কখন আছি, কখন নাই। মরার আগে আমি সব ঠিকঠাক করে না দিলে এরা নিজেদের মধ্যে গোলমাল করবে না? ... 'বাড়ি দিয়েছিলাম আমার মেয়েকে, মেয়ের কষ্ট দেখে ভাড়াটে উঠিয়ে দিয়ে তোমাদের থাকতে দিলাম। সেই মেয়েকে তো তুমি মেরেই ফেললে। আমার একমাত্র মেয়ে—।' (*আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১*, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬ -৩৭)

এ অভিযোগের জবাবে খুনি জামাতা আবুল হাশেম বেশ শান্ত গলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু এক্সিডেন্টের পূর্বাপর যে বিশ্লেষণ করেছেন গল্পকার তাতে পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, আবুল হাশেম সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে স্ত্রী রোকেয়াকে।

বোনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যখন টগবগ করে ফোটে ওসমানের মগজ তখন তাতে উস্কানির ঘি ঢালে আপন সহোদর আনিস। তার কয়েকটি সংলাপে আছে এ উস্কানির পরিচয়। যেমন—

১) এই লোকটা, এই বেটা হলো নাম্বারি শয়তান। কি অডাসিটি দেখলে? আব্বা নেহায়েৎ সিক, আদার ওয়াইজ আই উড হাড গিভন দ্য বাগার এ থরো বিটিং। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ৩৮)

২) দ্যাখো না শালাকে আমি কি করি! আব্বা একটু সেরে উঠুক, শালাকে আমি একেবারে সাফ করে দেবো, টোটাল এ্যানিহিলেশন। (ঐ)

কিন্তু এই আনিসই '৭১ সালে সুবিধা আদায় করার জন্য সম্পর্ক রেখেছিল আবুল হাশেমের সাথে। মধ্যবিত্ত বাঙালি কত সহজে নাম লেখাতে পারে দালালের খাতায় তা 'প্রতিশোধ' গল্পের আনিসকে দেখলে বোঝা যায়। বোন রোকেয়ার হত্যাকারী বলে তাকে খুন করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণের পর যখন আনিস জানতে পারে আবুল হাশেমের সঙ্গে মিনিস্টারের যোগাযোগ আছে, আর সে বলে দিলেই ঘোড়াশাল-টঙ্গি ট্রান্সমিশন লাইন তৈরির টেন্ডারটা পাওয়া যেতে পারে, তখন আনিসের ঠোঁটে বাজে তোয়াজের সুর।

কিন্তু বড় ছেলে ওসমান পারে না বোনের হত্যকারীকে ক্ষমা করতে। তার যে অবস্থান তাতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বিবেকতাড়িত সে শেষ পর্যন্ত হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয় লোহার রড। তবে এ রডটাও শেষ পর্যন্ত সে হাতে রাখতে পারে না।

পুরনো ঢাকার বাসিন্দাদের নিয়ে অন্য একটি গল্প 'যোগাযোগ'। এ গল্পের রোকেয়া, পিতা সোলায়মান আলীর সঙ্গে মামা বাড়ি যায় বড় মামার অসুস্থতার খবর শুনে। স্বামী হান্নানের কাছে সে রেখে যায় ছেলেকে। মামা বাড়ি যাওয়ার পর সে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়। তার মনে পড়ে শৈশবের ফেলে আসা দিনের কথা। শৈশবের অল্পচেনা এই গ্রামে থেকেই একদিন রোকেয়ার মা নুরুন্নেসা বৌ হয়ে সোলেমান আলীর বাড়িতে গিয়েছিল। মাতৃস্মৃতি অন্তরে ভেসে ওঠার পরপরই রোকেয়া সন্ধ্যেবেলায় আবছা আলোছায়ার মধ্যে সজনেতলায় তার মাকে দেখতে পায়। তার অবচেতন মন মায়ের কণ্ঠস্বর শোনে। অতঃপর—

মায়ের কণ্ঠস্বরে খুব চমকে উঠে তখন চারদিক তাকিয়ে দ্যাখে, না কোথাও কেউ নেই। সামনে পুকুর, পুকুরের ওপারে মাঠ, মাঠ ভরা পাকা ধানে হলদে জ্যোৎস্না অলস গা এলিয়ে ঘুম ঘুম চোখে শূন্যতা দ্যাখে। ডানদিকে দূরে কালচে সবুজ গ্রাম, বাঁ দিকে সুপারী বাগান। ওর মা কোথায় গেল তবে! (*অন্য ঘরে অন্য স্বর,* ১৯৭৬, পৃ. ৬২)

অশান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরে রোকেয়া শোনে স্বামী হান্নানের টেলিগ্রাম এসেছে। তার ছেলে ছাদের কার্নিস থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। অতঃপর ট্রেনে চেপে সে যখন ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হয় তখন তার মধ্যেকার ভাবনা, বর্ণনার সাহায্যে লেখক চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অতঃপর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে গল্পকার আবার জীবন্ত করে তুলেছেন নগর সভ্যতার নানা নগ্ন রূপ। গল্পের এক স্থানে রোকেয়া যখন নিজের ছেলেকে দেখার জন্য হাসপাতালে যায় তখন হাসপাতালের এক নগ্ন রূপ সে দেখে।

এদেশের হাসাপাতালগুলোর দুরবস্থা লেখক অতি অল্পকথায় যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে গল্পটি পেয়েছে এক নতুন ব্যঞ্জনা। জীবন বাঁচানোর তাগিদে এদেশের কম সংগতিপূর্ণ লোকেরা হাসপাতালে ছুটে যায় বটে, তবে সেখানে চিকিৎসার নামে অচিকিৎসা মানুষদের দ্রুত ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে। সে কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় রোকেয়ার পিতার মুখ থেকে।

> মেডিকেলের কথা কও বাবাজি, হ, তোমরা গেরামে থাকো, তোমরা কইবা না ক্যান ? তোমাগো ক্যামনে কই, ঢাকার হাসপাতালগুলি মানুষ মারণের ফ্যাক্টরি হইছে। (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*, ১৯৭৬, পৃ. ৬০)

লেখক ইলিয়াসের দক্ষতাপূর্ণ বর্ণনার গুণে আলোক-উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে গল্পটি। নিম্নবিত্ত পরিবারের কয়েকটি চরিত্র নিয়ে গল্পকার তাঁর গল্পের ভিত্তি স্থাপন করলেও তিনি দারিদ্র্যের কোন বর্ণনা গল্পের ভিতর তুলে ধরেননি, বরং স্নেহ, প্রেম, মায়া, মমতা ইত্যাদি আবেগগুলি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন দক্ষতার সাথে। আর এরই মধ্যে চমৎকারভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নগর সভ্যতার মানুষ-মারা ফ্যাক্টরি হাসপাতালের জীবন্ত রূপ। ইলিয়াসের অন্যান্য গল্পের মতো 'যোগাযোগ' গল্পটিও অভিনবত্বের দাবিদার।

বড় পরিসরের গল্প 'ফেরারী'। পুরনো ঢাকার অলিগলি ও সেখানকার অধিবাসীদের জীবনাচার যেভাবে ফুটে উঠেছে তাতে একে বলা যায়, অসাধারণ শিল্পসমৃদ্ধ ছোটগল্প। পুরনো ঢাকার জীবনাচরণ সম্পর্কে ইলিয়াস কতটা দক্ষ ছিলেন, তা এই গল্পে ফুটে উঠেছে। এমনকি তাদের ব্যবহৃত সংলাপগুলোও তিনি ব্যবহার করেছেন অসাধারণ দক্ষতার সাথে।

গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে একজন মৃত্যুপথযাত্রী বুড়োকে নিয়ে। পিতা ইব্রাহিমের অসুস্থতার কারণেই সন্তান হানিফকে বেরোতে হয় ডাক্তারের খোঁজে। নষ্ট সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী হানিফ। গুণ্ডা, জুয়াড়ু ইত্যাদি নষ্টবৃত্তের চরিত্রের সাথে তার মেলামেশা। পিতার অসুস্থতার সময় যখন সে ডাক্তার সন্ধানে ব্যস্ত, তখনি পথে দেখা মেলে বন্ধু সালাউদ্দিনের। সেই-ই তাকে পরামর্শ দেয় পাড়ার মতিন ডাক্তারকে না দেখানোর জন্য। কারণ মতিন ডাক্তারের রোগী দ্রুত যমের বাড়ি যায়। মতিন ডাক্তারের পরিচয় লেখকের বর্ণনায় যেভাবে ফুটে উঠেছে সালাউদ্দিনের কথায়, তা হলো—

> বড় রাস্তাটা পার হইলেই তো তোমার বাদামতলীর মাগীপট্টি, মতিন হালায় দাওয়াই দিত খানকি মাগীগো। আর খানকিগো ভাউরা থাকে না ?— হেইগুলিরে। মাগীপট্টির কেউগার ব্যারাম হইছে তো ডাকো হালায় লম্বুরে, জিন্দাবাহারের মইদ্যে হ্যার নামই আছিল খানকির ডাক্তার। (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*, ১৯৭৬, পৃ. ৭৫)

ঢাকা শহরের বিপথগামী ছাত্রসমাজ যে দুরবস্থার মধ্যে শহরকে চালিত করছে, তার আলাদা কোন বর্ণনা গল্পকার গল্পে উপস্থাপন না করে বরং চরিত্রের মুখে যে সংলাপ আরোপ করেছেন তাতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে বিপথগামী ছাত্রসমাজের জীবন্ত চিত্র।

'ফেরারী' গল্পে কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়েই গল্পকার পাত্র-পাত্রীর মুখে ভাষা আরোপ করেছেন। এই ঋদ্ধ বর্ণনার গুণে তিনি জীবন্ত করতে সক্ষম হয়েছেন সৃষ্ট চরিত্র, পরিবেশ, আবহ ও সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র। সাথে সাথে গল্পকার মনস্তত্ত্বও বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তো পিতা ইব্রাহিমের

চোখের সামনে হেঁটে বেড়ায় পেছনে ফেলে আসা স্মৃতি। বৃদ্ধ ইব্রাহিম দেখতে পায় অবিবাহিত ইব্রাহিমকে, সে দিব্য দৃষ্টিতে দেখে ভিক্টোরিয়া পার্কে যুবতীর হাত ইশারা।

পুরনো ঢাকার অলিগলি আর তাদের জীবনাচরণের পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরার জন্য গল্পকার 'ফেরারী' গল্পটিকে অনেক বেশি বিস্তৃতি দিয়েছেন বটে, তবে তা পাঠ করে পাঠক সামগ্রিকভাবে উদ্ধার করতে পারে পুরনো ঢাকার আদি, অকৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থার জীবন্ত চিত্র ও জীবনাচরণ। এই গল্পের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে রূপক, উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে সার্থকতার সাথে, যা সৃষ্টি করেছে এক অভিনব ব্যঞ্জনার। যেমন–

> আকাশে বড় সাইজের হলদে চাঁদ। এই সব সরু সরু রাস্তায় গলি উপগলিতে চাঁদের আলো আড়ষ্ট, এখানে ওখানে, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। লাজুক জ্যোৎস্না কোথাও কোথাও ময়লা রঙে খেলা করে। এই অসূর্যম্পশ্যা, কোমল ভাষিণী গুণবতী আলোতে কোন গুমোট নেই, জ্যোৎস্না থেকে হাওয়া বইছে। (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*, ১৯৭৬, পৃ. ৮৭)

যৌনতা মানব-জীবনে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে সাহিত্যে তার স্থান অবশ্যই থাকবে। তবে শালীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইলিয়াসের 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পটির মধ্যে মানব-জীবনের যৌন প্রসঙ্গ এসেছে অত্যন্ত অপরিহার্যভাবে, তবে এই গল্পে লেখকের খোলামেলা যে বর্ণনা, তাতে পাঠকেরা বেশ অস্বস্তিতে পড়ে।

> এক হাতে তার বেঢপ বড় গোলাপী রঙের ব্রামুক্ত স্তনজোড়া মেলে ধরে রূপসী, আরেক হাতে তার পেটিকোট সামলাতে ব্যস্ত। তার পেটিকোটের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, পেটিকোট অনেকটা নীচে নেমে যাওয়ায় ফাঁপা থামের মতো উরু বেশ খানিকটা দ্যাখা যায়, কিন্তু আশ্চর্য কোনো নিয়মে পেটিকোটের কোমর থেকে ঝোলানো ছেঁড়া এক টুকরো ন্যাকড়ার কল্যাণে তার যোনি অদৃশ্য। (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*, ১৯৭৬, পৃ. ১০৫)

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, রক্ত, সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামের এক স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের জন্ম হয়। এদেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন দেশ নিয়ে। কিন্তু প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির সমন্বয় ঘটেনি তাদের। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই রাতারাতি সব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে। এ সময়েই হঠাৎ হাতে ক্ষমতা পেয়ে যায় কিছু স্বার্থান্বেষী যুবক। রাতারাতি ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এ সব কায়েমী স্বার্থান্বেষী যুবক নিরীহ জনসাধারণের ওপর চালায় অত্যাচারের নির্মম রোলার। সে সময়ের ঘটনার জীবন্ত দলিল কিংবা ঘটনার নির্মম ইতিহাস আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোঁয়ারি' গল্পটি। তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার বিষাক্ত ভাইরাস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় ফারুক, জাফর, মানিক ভাইয়ের মতো চরিত্রগুলোকে। ইলিয়াসের বর্ণনার গুণে এ চরিত্রগুলো প্রাণময় হয়ে উঠেছে। সাথে সাথে অতি করুণভাবে ফুটে উঠেছে সমরজিৎ, অমৃতলালের চরিত্র।

গল্পের ভিত্তি গড়ে উঠেছে পুরনো ঢাকার রং-ওঠা পলেস্তারা খসে পড়া পুরনো একটা দালানকে নিয়ে। দালানটির মালিক সমরজিতের বুড়ো বাপ অমৃতলাল। অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা গেছে বুড়োর ওপর দিয়ে তবুও বুড়ো বাড়িটি হাতছাড়া করেনি। স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অনেক আঘাটে কুঘাটে ভাসতে ভাসতে বুড়ো আবার ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে বাপ দাদার এবং নিজের অতি

পুরনো আদরের ভিটেবাড়িতে। একটা পরিপূর্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বুড়ো মনে করেছিল, দেশ স্বাধীন, তাই সমস্ত অমঙ্গলকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ তার উল্টো। একদিন দেখা যায়, সমরজিতের কিছু পরিচিত যুবক তাদের বাড়িতে আসে। রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা এই সব যুবক হঠাৎ প্রস্তাব দেয় সমরজিতের কাছে—'তা তুমি কি ডিসাইড করলে সমরদা। তোমাদের বাড়িটা যে আমাদের দরকার।' অতঃপর বাড়িটা তাদের দরকার—এ বিষয়ে জাফর-ফারুকের উক্তি :

> জাফর : আপনাদের বাড়ীতে অফিস করতে পারলে কগজীটোলা, সূত্রাপুর, বাঙলাবাজার, ওদিকে ফরাশগঞ্জ, শ্যামবাজার—হোল এরিয়াটা কন্ট্রোল করা যাবে। প্রব্লেমটা বুঝতে পারছেন না কেন ? (*খোঁয়ারি*, ১৯৮২ ,পৃ. ২৪)
>
> ফারুক : মানিকভাই আমাদের ইয়াং জেনারেশনের আনলিমিটেড এনার্জিকে ঠিকভাবে চ্যানেলাইজড করতে চায়। তোমরা যদি কো অপারেট না করো-। (*খোঁয়ারি*, ১৯৮২, পৃ. ২৫)

ফারুক-জাফরের চলে যাওয়ার পর বুড়ো বাপের মুখোমুখি হয় সমরজিৎ। পিতা বারবারই উচ্চারণ করেন প্রলাপের মতো তার পিতৃপুরুষের ফেলে আসা অতীত ঐতিহ্যের কথা। আর মৃত অতীতের সাক্ষী সমরজিৎ নিজের ঘরের বারান্দায় সিগারেটের খোলস তামাক-মুক্ত করে গাঁজাযুক্ত করে। তারপর তাতে সুখটান দেয়।

গল্পটি নিগৃহীত সংখ্যালঘুদের বন্দিদশার ছটফটানির চমৎকার কথ্য চিত্রায়ণ। দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভবের ফলে ধর্মের লেবাস পরে জাতিপীড়নের যে ঘটনা তা ঐতিহাসিক।

> ১৯৪৭-এ ভাগাভাগির সময় পাঞ্জাবে প্রচণ্ড দাঙ্গা হয়, বহু হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় প্রাণ হারায়। অসংখ্য নারী নির্যাতিত হয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান নর-নারী পিতৃপুরুষের ভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারপরে ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার কারণে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুরা কোন সময়ই নিরাপত্তা অনুভব করেনি। ফলে পাকিস্তান থেকে বিরাট সংখ্যক হিন্দু দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। তেমনি এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যান। এতে কোটি কোটি লোকের অশেষ অবর্ণনীয় ও সীমাহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, শত সহস্র নিরীহ নির্দোষ জীবন অকালে ঝরে গেছে।[৬]

সংখ্যালঘুরা স্বাধীন দেশে কতটা যন্ত্রণাবিদ্ধ ছটফটানি নিয়ে টিকে আছে তার একটা খতিয়ান 'খোঁয়ারি' গল্পে ফুটে উঠেছে। বিদেশি উপনিবেশবাদীদের হটিয়ে বাহ্যিকভাবে শাসনতন্ত্রের ওপর যতই লেপেপুছে স্বাধীনতার পোশাক পরানো হোক না কেন শাসকদের অন্তরে যদি সত্যিকারের মানবিকতা না থাকে তাহলে স্বাধীনতা পরিবর্তিত হয়ে যায় স্বৈরতান্ত্রিকতায়। ইংরেজরা ক্ষমতার চেয়ার আকড়ে রাখার জন্য বারবারই উস্কে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতাকে। সেই ঘটনারই চর্বিত-চর্বণ দেখা গেছে স্বাধীনতাপরবর্তী সময়েও। ফলে খোলস বদল হয়েছে বটে তবে আত্মা থেকে গেছে একই। সেই আত্মার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বার বারই অস্বস্তিতে পড়েছে অমৃতলালেরা বা সমরজিৎ-এর মত নিরীহ লোকেরা। তাদের সামনে থাকেনি কোন বর্তমান, কোন ভবিষ্যৎ। তাই বাঁচার অবলম্বন হিসেবে শেষ পর্যন্ত সমরজিৎ আশ্রয় নেয় ফেলে আসা অতীতে। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় পুরনো দিনের গান।

প্রাত্যহিক দিনলিপি, ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা, সংসারের নানা রকম খুঁটি-নাটি প্রসঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে 'অসুখ বিসুখ' গল্পটি। গল্পটি আবর্তিত হয়েছে অতমন্নেসা, তার ছেলে ছোবহান, ছেলে-বৌ সিতারা, নাতি আলম, মেয়ে মতিবানু ও নুরুন্নেসা, মেয়ের স্বামী (মতিবানুর স্বামী) সুরুজ মিয়াকে নিয়ে। প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাগুলো রূপদানের সাথে সাথে ইলিয়াস অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই যেন খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর ছবি তোলেন নিজ মন-ক্যামেরায়। পরে তা উপস্থাপন করেন পাঠকের সামনে। তীক্ষ্ণ জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টি নিয়ে লেখক বর্ণনা করেন একেবারে নিখাদ বাস্তবতায়। যেমন-

১. সিতারা তখন উঠানের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছেলের পাছায় জল ঢেলে দিচ্ছে, রাস্তার ধারের নালা থেকে আলম এক্ষুণি পায়খানা কর এলো। (*খোঁয়ারি*, ১৯৮২, পৃ. ৩৬)

২. আলমের উরু, পায়ের পাতা সব জায়গায় গু লেগে ছিল। এ সব ভাল করে ধুতে গেলে সে চেঁচিয়ে ওঠে, সিতারা তার দুই গালে কষে চড় লাগায়। পায়খানার চটের পর্দা ধরে আলম আর্তস্বরে কাঁদতে শুরু করলে সিতারা ধীরে সুস্থে বারান্দায় আসে। (*খোঁয়ারি*, ১৯৮২, পৃ. ৩৭-৩৮)

এই গল্পের ভিতর পারিবারিক রেষারেষির বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের "এসব অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের যে পরিবেশন-নৈপুণ্য, তার মধ্যেই ধরা পড়ে কথাশিল্পের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য। যেহেতু জীবনকে নিয়ে কথাশিল্পের কারবার, সুতরাং সে জীবন যদি শুধু কতকগুলো মতবাদের লক্ষ্য হয় তাহলে জীবনের পরিস্ফুটনা কথাশিল্পের স্বভাবানুগ হয় না। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর ছোটগল্পে জীবনকে কখনো মতবাদের অনুগামী করেননি, বরং মতবাদই সেখানে জীবনের অনুগমন করেছে। এই বিশেষ গুণটির জন্যই একজন বিশুদ্ধ কথাশিল্পীর শিল্পচিন্তা ও তার প্রয়োগগত নৈপুণ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না।"[৭]

সন্দেহপরায়ণা নারী তারা বিবিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'তারা বিবির মরদ পোলা' নামের গল্পটি। মা পুত্র, তারা বিবি ও গোলজারকে নিয়েই এ গল্পের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। গোলজার ভদ্র একজন যুবক, তাই তো অতি সহজেই সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে বন্ধু আসাদুল্লার বোতল খাওয়ার ও কুস্থানে যাওয়ার প্রস্তাব। মানুষের অন্তরতম প্রদেশে অন্য যে মানুষের অবস্থান, তাকেও সিদ্ধতার সাথে গল্পে উপস্থাপন করেছেন ইলিয়াস। তাই তো দেখা যায়, মা গোলজার বিবি ও বধূ সখিনার অনুপস্থিতিতে কাজের মেয়ে সুরুজের মার সুঠাম দেহে আকৃষ্ট হয়ে গোলজার তাকে কাছে টানার চেষ্টা করে।

এ গল্পের যে দিকটা পাঠককে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে, তা তারা বিবির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। মা ছেলেকে সব সময় সন্দেহের চোখে দেখে, অথচ গল্পে পিতা যখন ছেলেকে দেখছে সন্দেহের চোখে, তখনই মা আবার পক্ষ নিচ্ছে ছেলের এবং বুড়ো স্বামীর যৌন-অক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ করে বলছে—

এমুন চিল্লাচিল্লি করো ক্যালায় ? গোলজারে কি করেছে ? পোলায় আমার জুয়ান মরদ না এখখান ? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইয়া গেছো কবরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝিবা ক্যামনে ? (*খোঁয়ারি*, ১৯৮২, পৃ. ৭০)

'পিতৃবিয়োগ' গল্পে গোটা কয়েক মানুষের একেবারে অন্তর অভ্যন্তরে দৃষ্টির ফোকাস ফেলে তাঁদের ছবি এঁকেছেন ইলিয়াস। পোস্টমাস্টার আশরাফ আলীর যে চেহারা দেখতে অভ্যস্ত তার ছেলে ইয়াকুব, তা আত্মীয় স্বজনের ভাষায় 'হাড়িমুখো পোস্টমাস্টার'। মুখখানা তার সিলমারা ডিজাইনে আঁটা। ইয়াকুব তার মাকে হারিয়েছে জন্মের সময়। বাবার স্নেহ কী তা সে উপলব্ধি করতে পারেনি আজীবন। বাবার সঙ্গে মামাতো ভাইদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখে ইয়াকুব দূর থেকে শুধু নীরবে গুমরে কেঁদেছে। নিজ পিতার এই নির্লিপ্ততা আর বাবা সম্পর্কে মামা খালাদের কাছ থেকে শোনা নানা মন্তব্যের জবাবে একরকমের দুঃখবোধের জন্ম হয় ইয়াকুবের অন্তরে। সেই দুঃখবোধ নিয়েই সে একরকম চলছিলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় পিতার মৃত্যুর পর।

বাবার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ছেলে একটা কল্পনার জাল বুনে নিয়েছিলো অন্তরে। কিন্তু মৃত্যু সংবাদ শুনে পিতার সর্বশেষ কর্মস্থলে আসার পর সেখানকার মানুষজন যেভাবে মৃত আশরাফ আলীকে উপস্থাপন করে ছেলের কাছে তাতে ইয়াকুবের কল্পনার জাল শতছিন্ন হয়ে যায়। ঘৃণা, অনুকম্পা, অশ্রদ্ধা, উপেক্ষা ইত্যাদি নানা আবেগের জন্ম হয় ছেলের মনে। লেখক নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে আবেগক্ষরণ ঘটিয়েছেন ছেলের অন্তরে। যেমন গফুর পিওনের কথা–

> শালার এহোসান ডাক্তারই মাস্টার সায়েবের খেলো, বইলেন ? শালা পেত্যেক দিন নিজির দোকানে বসি ওঁয়ারে মৃতসঞ্জীবনী খাওয়াতো। বাঞ্চোৎ কিপ্টের একশেষ, নিজেও ওঁয়ার পয়সায় বোতল বোতল মাল গিলতো। মাস্টার সাহেবের বুকির ব্যথা হলো মাল খেতি খেতি! এই মাটির মানুষটারে, শালা শেষ করি ফেললো। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ১৫৭)

এ কথা শোনার পর ইয়াকুবের অন্তরে বাবা সম্পর্কে জন্ম নেয় এক অব্যক্ত ঘৃণা। আবার করিম গাজী যখন হাত নাড়িয়ে তার মেয়ের অসুস্থতার বর্ণনা দিতে গিয়ে জানান দেয়—

> শেষমেষ মাস্টার সাহেব দেখতি গেলো— নিজ হাতে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেইখে তার মুখি তুলে দেয় তবে তার পেটে অন্ন পড়ে। মাস্টার সাহেব বলে—'ও মণি তুমি না খাওতো তোমার এই ছেলিটা না খেয়েই মরবে।' (ঐ)

তখন নিজের ছেলের প্রতি স্নেহে ঔদাসীন্য আর পরের সন্তানের প্রতি দরদ ইয়াকুবের অন্তরে জন্ম দেয় এক নীরব দ্রোহের। তাই শেষ পর্যন্ত পিতার কুলখানি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করেই, ভোরের আলো ভালো করে ফোটার আগেই, পিতার কর্মস্থলের অপরিচিত রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করে ইয়াকুব।

'পিতৃবিয়োগ' গল্পের ওসমান একজন সাধারণ পোস্টমাস্টার। এ পোস্টমাস্টার "থাকতো তার পড়ালেখা নিয়ে, অঙ্ক বাঙলা ভালোই জানা ছিলো, দিনরাত্রি হয় পড়ালেখা নয় কোরান তেলায়াৎ।" এই পড়ালেখা ও কোরান তেলায়াৎ করা লোকটা পরে বেমালুম বদলে যায়। কেন ? তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত গল্পকার গল্পের কোথাও দেননি, এছাড়াও পোস্টমাস্টার একবার যে চিঠি লিখেছে, তাতে স্বল্পশিক্ষিত ওসমানের পরিবর্তে পাঠকের সামনে হাজির হয় উচ্চশিক্ষিত ও দার্শনিক এক চরিত্র। ওসমানের লেখা চিঠি–

> জাগ্রত অবস্থায় তরল বিষয়ের প্রতি অবাঞ্ছিত মনোযোগ ও অহোরাত্র লঘু কল্পনার জগতে অনুচিত বিচরণই এই রূপ স্বপ্নদর্শনের কারণ, চিত্ত উচ্চস্তরের চিন্তাদ্বারা শক্তিশালী হইলে এইরূপ কলঙ্ক ঘটিবার সম্ভাবনা রহিত হয়। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ১৫২)

গল্পের এই একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও ওসমানের দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলে গল্পের এ অংশটি হয়ে পড়েছে বাড়তি মেদবহুল। লেখক যদি সরল বাক্যে স্বল্পশিক্ষিত পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে নিতেন তাহলে গল্পটি আরও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারতো। এই রকম দু'একটি ছোটখাট ত্রুটি বাদ দিলে 'পিতৃবিয়োগ' হয়ে উঠেছে চমৎকার একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প।

*খোঁয়ারি* গল্পগ্রন্থের সব গল্প পরিসরে বেশ বড়। এ গ্রন্থের সব গল্পে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন পুরনো ঢাকার মানুষের জীবনাচরণ। গল্পগুলি বড় মাপের হলেও তা থেকে পাঠক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নিতে সক্ষম মানুষের জীবন ও মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো। এখানেই গল্পকার ইলিয়াসের কৃতিত্ব।

*অন্য ঘরে অন্য স্বর* ও *খোঁয়ারি* গল্পগ্রন্থের সব গল্পেই বলতে গেলে ঘুরে ফিরে এসেছে নগর জীবন ও নগরের কথা। *দুধভাতে উৎপাত* গল্পগ্রন্থে এসে লেখকের সে ভাবনা মোড় নিল গ্রামবাংলার দিকে। এ গ্রন্থের বেশ কিছু গল্পেই লেখক পল্লিনির্ভর জীবনের সমস্যাকে উপস্থাপিত করেছেন। এ সংকলনে মোট চারটি গল্প—'মিলির হাতে স্টেনগান,' 'দুধভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল' ও 'দখল'।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এ দেশে হাজারো সমস্যা দেখা দেয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার নেশায় এক শ্রেণীর লোক অনিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের রেসের ঘোড়া ছোটায়। আর যারা ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে উদিত করতে সক্ষম হয়েছিল পূর্ব দিগন্তে, তারা পিষ্ট হতে থাকে বঞ্চনার যাঁতাকলে। এরই আলোকে লেখা ইলিয়াসের 'মিলির হাতে স্টেনগান' নামের গল্পটি। এ গল্পে কোন কোন স্থানে মানুষের অন্তরে নতুন আশা সঞ্চারের মাধ্যমে লেখক সমাজ-সংসারে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগান। একই সাথে তিনি আশাভঙ্গের নিশানাতে সূক্ষ্ম তাক করে ঢিল ছোঁড়েন। বিকৃতমস্তিষ্ক পাগলা আব্বাস আফসার আলি ও বেপথু রানাদের অবৈধ উত্থান উৎখাত করার জন্য মিলির সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু আব্বাস পাগলা যখন সুস্থ হয়ে ওঠে তখন সে ভিড়ে যায় রানাদের দলে। তাকে বলতে শোনা যায়, 'রানারে একটু বুঝাইয়া কইয়ো। রানারা কয় বন্ধু একটা ইন্ডেটিং ফার্ম করছে। রানা ইচ্ছা করলে আমারে প্রভাইড করতে পারে'। একথা শোনার পর বোঝা যায়-

> স্বাধীনতার মহান চেতনা ভূলুণ্ঠিত হয় নয়া শাসক ও শোষিতের আবির্ভাবে, এ রকম দমবন্ধ করা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা আব্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও তার স্বাভাবিকতা হারায়।[৮]

শেষ অবধি লেখক অবশ্য পাঠকদের আশাবাদে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, সে কারণেই মিলির হাতে শেষ পর্যন্ত তিনি স্টেনগান তুলে দেন। এ ধরনের ইঙ্গিতময়তায় লেখক এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন, অপশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বাঁচার সংগ্রাম চলছে এবং চলবে।

এ দেশের বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার যে কাহিনী, তা ইলিয়াসের কলমে অতি মর্মান্তিকভাবে ফুটে উঠেছে 'দুধভাতে উৎপাত' নামের গল্পে। গল্পটি পড়ার পর পাঠক মাত্রই দরিদ্র, পীড়িত মানুষের হাড়-পাঁজরা কাঠি পর্যন্ত যেন দেখতে পায় নিখুঁত ও স্বচ্ছভাবে।

বড়লোক হারুন মৃধার কাছ থেকে আধামণ চাল ধার নিয়েছিল জয়নাব। সে চাল শোধ দিতে না পারায় হারুন মৃধা জোর করে ধরে নিয়ে যায় জয়নাবের দুধাল গাভীটা। গাভীর শোক ভুলতে পারেনি জয়নাব। সে কারণে রোগ পাণ্ডুর অবস্থায় সে যখন ভুগে ভুগে কঙ্কালসার, তখন একদিন ইচ্ছা ব্যক্ত করে দুধ খাওয়ার। ছেলে ওহিদুল্লা দুধ আনতে যায়, তখন হারুন মৃধার কাছে তাকে শুনতে হয়, 'তোর মায়ের প্যাট খারাপ, তগো হইছে মাথা খারাপ।' গল্পের এ স্থানে লেখক অতি অল্প কথায় শ্রেণী বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন দক্ষতার সাথে। বৈষম্যের ব্যবধান আরো দীর্ঘতর হয় যখন হাশমত মুহুরির নাতনি, যে কিনা-

> শহরবাসীর স্কুলে-পড়া ফ্রক-পরা কন্যা কামড়ে কামড়ে পেয়ারা খাচ্ছিলো, মুখে পেয়ারা নিয়েই সে বলে, 'দুধ আমার ভাল্লাগে না। আবার মানুষ সখ করে খেতে চায়? মাগো!' (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ১৮৮)

এ গল্পের লেখক শুধু দুধভাত নয়, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের ছবি জীবন্ত করতে অনুষঙ্গ হিসেবে গল্পে এনেছেন নিরন্ন মানুষ আর বড়লোকের বাড়ির পোষা মুরগির কথা। শ্রেণীবৈষম্য ইলিয়াসের লেখনীর গুণে যেন বাস্তবতার গা থেকে ছাল চামড়া সব খুলে নিয়ে উলঙ্গ করে দিয়েছে ধবধবে রক্তমাংসের শরীরকে। ওহিদুল্লা মায়ের জন্য দুধ আনতে গিয়ে যখন মুহুরি বাড়ির উঠোনে, তখন মুহুরির বৌ এ্যালুমুনিয়ামের থালা থেকে গম ছিটাচ্ছিল মুরগির পালের জন্য।

গল্পের শেষে এসে প্রচণ্ড বমি করে জয়নাব। সে-বমির তোড়ে ভেসে যায় তার দুধ খাওয়ার সাধ ও চাহিদা দুটোই। শেষপর্যন্ত সে ঢলে পড়ে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে, তবু মরার আগে রোপণ করে যায় প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের বীজ। তাতেই যেন পাঠক অনাচারের ঘোর অমানিশার মধ্যে দেখতে পায় আশার আলো—

> জয়নাব হুঙ্কার ছাড়ে 'বুইড়া মরদটা ! কি দেহস ? গোরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কি দেহস!'— জয়নাবের শ্যাওলা পড়া চোখ জোড়া দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল, মনে হয় ঘরের স্যাঁতসেঁতে শূন্যতায় হঠাৎ ভেসে ওঠা কোন দৃশ্য প্রাণ ভরে দেখবে বলে চোখ জোড়া সম্পূর্ণ ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ওহিদুল্লার গলা থেকে ফিস ফিস আওয়াজ বেরোয়, 'যাই মা'। ... ওহিদুল্লার পায়ের পাতা বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য শিরশির করে। এতো বমির পর নির্ভার মায়ের মুখের যে কঠিন চেহারা হয়েছে, তাতে তার হুকুম তামিল না করে ওহিদুল্লার কি রেহাই আছে? (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ১৯৫)

গ্রাম ও শহরের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন গল্পকার তাঁর 'পায়ের নিচে জল' নামের গল্পে। এ গল্পে গ্রাম তাঁর লক্ষ্য আর উপলক্ষ হিসেবে এসেছে শহর। ঘুরে ফিরে ইলিয়াসের গল্পে শহর আসার যে বিষয়, সেটি নগর জীবনের প্রতি তাঁর এক ধরনের মোহ বলা যায়। এ গল্পে লেখক শ্রেণীসচেতনতা সম্পর্কে নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোসিওলজির ছাত্র আতিক গ্রামে আসছিল নিজেদের জমিজমা বিক্রি করবে বলে। কৃষকের কর্মসংস্থানের ওপর থিসিস লেখার সাধ অন্তরে লালন করতো আতিক। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে গ্রামের কৃষকদের জীবনব্যবস্থা দেখতে চেয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই

তার কাছে জীবন্ত হয় হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বর্গাচাষী কিসমতের পরিবার ও সুবিধাভোগী আলতাফ মৌলবির নগ্ন রূপ।

গ্রামের অবস্থাপন্ন জোতদার আলতাফ মৌলবির কাছে জমি বিক্রির জন্য বড়ভাই আতিককে পাঠিয়েছে গ্রামে। কারণ—

> ধানমণ্ডির বাড়ি তিনতলা করতে হবে, টাকা চাই। গুলশানের প্লট আর কতোকাল ফেলে রাখবে– টাকা চাই। মেজোভাই ইকনমিকস পড়ার জন্য হার্ভার্ডে এ্যাডমিশন পেলেও স্কলারশিপের নিশ্চয়তা নাই, টাকা চাই। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ২০৬)

যখন শহরের মানুষ একদিকে বিত্তশালী হওয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রত তখন তারই বিপরীতে গ্রামের মানুষ দিন দিন আরো এগিয়ে যাচ্ছে মানবেতর জীবনের দিকে। এরকম পরিস্থিতিতে বর্গাচাষী কিসমতের ছেলে আকলুকে বলতে শোনা যায়— 'জমিতো আমাগো আছেই। আমাগোর জমি বান্দের উপরে। আমরা বান্দের জমিন্দার।' এ উক্তির মাধ্যমে আকলু গোটা শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছে।

এদেশে যে সমস্ত বামনেতা বুলিসর্বস্ব নীতিহীন রাজনীতির ধ্বজা উড়িয়ে আখের গোছাতে ব্যস্ত, ইঙ্গিতময়তায় লেখক এ গল্পে তাদের চরিত্রের কদর্য রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন স্বল্প পরিসরে। আতিকের বড় ভাই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

> দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না বলে বড়োভায়ের আক্ষেপের সীমা নাই। গুলশানে বাড়ি করে সমাজতান্ত্রিক কোনো দেশের এমব্যাসিকে ভাড়া দিলে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে একটা লিঙ্ক থাকে, মাসে বিশ পঁচিশ হাজার টাকাও আসে। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ২০৬)

জোতদার মোয়াজ্জেম হোসেন, তার ছেলে বিপ্লবী মোবারক হোসেন ও নাতি ইকবালকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'দখল' গল্পের প্রেক্ষাপট। রাজশাহী জেলে মোবারক হোসেনকে যখন গুলি করে হত্যা করা হয় তখন ইকবালের বয়স পুরো ৮ মাসও হয়নি। মোবারকের মৃত্যুর পর পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষার হাল ধরে তারই সহোদর মোতাহার। ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে, ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা দেখানোর জন্য মোতাহার যতই উচ্চারণ করুক 'ভাইজান নিজেতো গেলো, আমাদেরও পথে বসালো', এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না ইকবাল।

'দখল' গল্পের মধ্যে ইলিয়াস কিছু রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগতি অসংগতি তুলে ধরেছেন। শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সার্থক চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এ গল্পে। জোতদারদের শোষণ ব্যবস্থা, কামলা খাটানো প্রভৃতি দৃশ্যের অবতারণা করে একেবারে চাঁচাছোলাভাবে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন গল্পকার।

গল্পের প্রতিনিধিত্বকরী চরিত্র ইকবাল তার পিতাকে হারিয়েছে একেবারে ছেলেবেলায়। তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই হয়নি। তবুও নিকটজনদের কাছে শুনে শুনে পিতার যে আদর্শ সে লালন করে অন্তরে, সে আদর্শ আশাবাদের জন্ম দেয় পাঠকদের মনে। তাই গল্পের শেষাংশে দেখা যায়, মোবারক হোসেনের কবরের পাশে শূন্য যে কবর, যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত জোতদার মোয়াজ্জেম হোসেনের জন্য সেখানে–

ইকবাল লাফ দিয়ে বসে পড়ে শূন্য কবরের ওপর। এতো সোজা। মোয়াজ্জেম হোসেন কে ? ওর বিপ্লবী বাপের পাশে থাকবে এই শয়তান বুড়োটা ? এই মানুষমারা, ঠক ও শোষক শয়তান জোতদার। এত সোজা। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ২৩০)

গল্পের এই অংশে কবর দখলের মাধ্যমে যে প্রতীকী ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, তাতে পাঠক বুঝতে পারে আদর্শের মরণ নেই। হয়তো সাময়িকভাবে তা স্তিমিত হতে পারে। তবে আদর্শ থেকে একদিন না একদিন জন্ম নেবেই সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার ধ্বজাধারী প্রজন্ম।

'দোজখের ওম' গল্পগ্রন্থে মোট চারটি গল্প স্থান পেয়েছে : 'কীটনাশকের কীর্তি', 'যুগলবন্দি', 'অপঘাত', ও 'দোজখের ওম'। ইলিয়াসের অন্যান্য গল্পের মতো এ গ্রন্থের গল্পগুলো নিয়েও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এখানেও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

এ গ্রন্থের প্রথম গল্পটি গ্রাম্য বালিকা অসিমুন্নেসার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বিষপানে আত্মহত্যা করে এ গ্রাম্য বালিকা। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গল্পকার শ্রেণী শোষণের একটা চমৎকার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পটিতে বাস্তব ও পরাবাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গল্পকার একটা ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছেন এবং তিনি সফলও হয়েছেন। বিষয়, প্রকরণ ও শিল্প সমৃদ্ধতায় তাঁর 'কীটনাশকের কীর্তি' বাংলা ছোটগল্পে একটা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

আত্মহত্যাকারিণী অসিমুন্নেসার ছোট ভাই রমিজালী মিঞা ঢাকার এক বিত্তবান ব্যক্তির বাসায় কাজ করে। সে-বাড়ির চাকর-নফর, দাসী-বান্দি, ড্রাইভার-খানসামা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে আপন আপন কাজ করে। এহেন পরিবেশে থেকে রমিজালী মিঞা একদিন খবর পায় তার বোনের আত্মহত্যার। নিজের বাড়িতে যাবে—এরকমের একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে রমিজ ছুটি চাইতে উপস্থিত হয় গৃহকর্তার সামনে। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না; কারণ কুত্তা-বেড়াল বেষ্টিত খবরের কাগজে ঢাকা সাহেবকে বলতে চাইতেই বিলেতি কুকুর জিপসি বার বারই গরর গরর শব্দ করতে থাকে। আর সাহেবের মেয়ে বাপের সাথে ভেজাল মিশ্রিত বাংলা-ইংরেজিতে কথা বলতে থাকে। সুতরাং—

সাহেব বাড়ী থাইকা চিঠি আইছে, পোকের ওষুদ খাইয়া আমার বোইন মারা গেছে, আমারে আজ বাড়ী যাইতে হইবো, কিছু ট্যাকা দ্যান, দারগা পুলিশের খরছ জোগাইতে বাবার চাইরশো টাকার উপরে করজো হইছে। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ২৩৬)

কথাগুলো আর বলা হয়না।

ছুটি চাওয়ার অক্ষমতার কারণে এবার রমিজ রেগে যায় নিজের বোনের প্রতি। সে দিব্য দৃষ্টিতে দেখে, মিরধা বাড়ির ম্যাট্রিক পাস পাট ক্ষেতের মধ্যে বুবুর সর্বনাশ করছে। অথচ হাফিজুদ্দিনের সাথে বুবুর বিয়ে হয়েছিল কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ তাকে ছাড়েনি। অবশেষে ছেনাল মেয়ে নিয়ে ঘর করতে পারবে না, একথা বলে হাফিজুদ্দিন বধূ অসিমুন্নেসাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। অসিমুন্নেসা তখন বাধ্য হয়ে কীটনাশক খায়। একটা বিজাতীয় আক্রোশে রমিজ, সাহেবের মেয়ের ঠোঁটে র‍্যাটমের গুড়ো লাগাতে চায়। সে সফল হয় না, বরং পরিবর্তে বেদম মার খায় বাড়ির মালী, দারোয়ান, চাকর-বাকরের হাতে।

গল্পের এক স্থানে অতি অল্প কথনে রমিজের মনের ভেতকার যে ভাবনা গল্পকার টেনে এনেছেন, তাতে শহুরে জীবনের কৃত্রিমতার ছবি অতি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে পাঠকের সামনে।

নগরের অভিজাত এলাকার চিত্র সূক্ষ্মভাবে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন 'যুগলবন্দি' গল্পে। নিজের তীক্ষ্ণ জীবনবোধ এ ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে তাঁকে। কতকটা কৌতুকের সাহায্য নিয়ে ইলিয়াস এক ডাক-সাইটে উচ্চপদস্থ জাঁদরেল অফিসারের চরিত্র চিত্রণ করেছেন এ গল্পে, যে অফিসার কিনা-

> এঞ্জিনিয়রদের সিমেন্ট-বালির অনুপাত সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, এ্যান্টিবায়োটিক কোথায় প্রয়োগ করা উচিত তা শিখিয়ে দেয় ডাক্তারদের, কলেজের বুড়ো প্রফেসর দ্যাখা করতে এলে তাকে প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে ক্লাসে রোল কল করার সঠিক ও আধুনিক পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়েছিল। ঝাড়ুদারদের ঝাড়ু ধরার কায়দা দেখিয়ে দেয়, আইন গাইনের যথাযথ উচ্চারণ সম্বন্ধে তার এলেম জবরদস্ত আলেমদের স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মেয়েদের পটাবার বিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত লম্পটদের সে হার মানাতে পারে, কুকুর কখন কি খেতে ভালবাসে সংশ্লিষ্ট কুকুরদের চেয়ে সে ভাল জানে। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ২৬৬)

'৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির উপর ভিত্তি করে লেখা 'অপঘাত' গল্পটি। জোয়ান ছেলে বুলু বৌডোবা খালের ব্রিজে মিলিটারি লরি উড়িয়ে দেওয়ার সময় নিহত হয়। বাংলা ছোটগল্পে অনেক স্থানেই পাত্রপাত্রীর মৃত্যু প্রসঙ্গ এসেছে। কোন কোন মৃত্যু কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ না হওয়ায় তা হয়েছে আরোপিত এবং সে ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের শরীরে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক শিল্পহীন ক্ষতের। কিন্তু এখানে "মৃত্যুর ন্যায্যতা নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হয় গল্পে। এর জন্য লেখককে কোন ব্যাখ্যা দিতে হয়নি। গল্পই বুলুর মৃত্যুকে মর্যাদা দেয়"।[৯] বুলুর মৃত্যুর খবরটা গ্রামের চেয়ারম্যান সাহেব ঠিকই জানেন, তবে তিনি খবরটা প্রকাশ করতে সাহস পান না। কেননা তার ছেলে শাজাহান মৃত বুলুর দোস্ত। শাজাহান অবশ্য যুদ্ধে না গিয়েও মারা যায় টাইফয়েড জ্বরে। মিলিটারিদের অত্যাচারের কথা অতি অল্প বর্ণনায় লেখক জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মৃত বুলুর মা যখন আহাজারি করতে থাকে পুত্রের জন্য, তখন স্বামী মোবারক তাকে ধমক দেয় ছেলেকে আগলে রাখতে পারে নি কেন সেজন্যে।

এ গল্পে লেখক আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধের সময় গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এ আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহার করেছেন। যেমন-

> একবার চোখের দেখাটাও দেখবার পারনু নাগো! কোটে কোন পাথরের মধ্যে একলা একলা দাপাদাপি কর্য়া মরলো, মুখোত এ্যানা পানিও পালো নাগো। হামার ব্যাটার উপরে ইস্কা গজব কিসক পড়লো গো? আল্লাহর বিচার ক্যাক্ষা কও তো ? তার মাটিও হয় না, কোটে কোন কাদার মধ্যে পড়্যা থাকে কও তো। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ২৭৭)

তবে সবকিছু ছাপিয়ে এই গল্পের বড় প্রাপ্তি হলো, মুক্তিযুদ্ধের জন্য বাঙালির যে গর্ব, তা। "হাজার বছরের সংগ্রাম সাধনায় যে কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে বাঙালির ইতিহাসে তা সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠন এবং তা বিপুল বিশাল জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম ও বিপুল আত্মত্যাগে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন এটাই পূর্ববাংলার বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবগাথা"।[১০]

স্বাধীনতার পরে নব্যসুবিধাবাদীরা মুক্তিযুদ্ধকে বাণিজ্যপুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে নানা ফায়দা লুটেছে। গল্পকার ইলিয়াস পাঠককে চিনিয়ে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা কৃতিত্বের দাবিদার কারা তা। শেষপর্যন্ত পাঠক গ্রামীণ এক খেটে খাওয়া মানুষ মোবারক আলির কাছ থেকে উচ্চৈঃস্বরে জানতে পারে তার ছেলে বুলু অপঘাতে নয়, যুদ্ধ করে মরেছে।

'অপঘাত' গল্পটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল।

রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ কামালউদ্দিনের যন্ত্রণাতুর হৃদয়ের করুণ আর্তি ও পৃথিবীতে যে অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা তারই সাহিত্য রূপ দিয়েছেন ইলিয়াস তাঁর 'দোজখের ওম' গল্পে। এ গল্পে "আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জীবনদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দিয়ে বৃদ্ধ কামালউদ্দিনের জীবন পর্যবেক্ষণ করেছেন।"[১১] বেশ বড় পরিসরে লেখা এ গল্পের ক্ষেত্র পুরনো ঢাকার অলি-গলি।

কামালউদ্দিনের অসুস্থতা আর স্মৃতিচারণের মধ্যে একটা গোটা জীবনের, সেই সাথে পুরানো ঢাকার সমাজচিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সার্থকভাবে। কামালউদ্দিন যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় অথবা অসুস্থ পাণ্ডুর দেহে ঝিমায় তখন তার মৃত স্ত্রী সামনে আসে। সংসারের হাজারো সুখ-দুঃখের কথা হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। এই স্মৃতিকথার কোন কোনটা শক্ত হয়ে বিঁধে আছে কামালউদ্দিনের মগজে। এই শক্ত কথাগুলো মাথার মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে ফোটাকে লেখক উপমিত করেছেন সুচ ফোটার সঙ্গে। বার-বারই ঘুরে ফিরে এসেছে সেলাই ও সুচ সুতার প্রসঙ্গ। কারণ কামালউদ্দিনের পেশা ছিল দর্জিগিরি।

জীবন-সায়াহ্নে বৃদ্ধ কামালউদ্দিন যখন অসুস্থ শরীরে বসে কিংবা শুয়ে ফেলে আসা দিনের হিসেব মেলাতে বসে তখন তার সামনে কখনো পাপ আবার কখনো পুণ্যি চক্রাকারে ঘুরপাক খায়। পাপ-পুণ্যের হিসেব মেলাতে গিয়ে সে দেখতে পায়, তার জীবনে পুণ্যির চেয়ে পাপের মিছিল বড়। অথচ জীবনে এই লোক খুব কমই কাজা করেছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। কাজের চাপে মাঝে-মধ্যে আছরের নামাজ তার পক্ষে আদায় করা সম্ভব হতো না ঠিকই, কিন্তু প্রায়ই সে আদায় করে নিত কাজা নামাজ। অথচ তার জীবনের ফেলে আসা যে গুটি কয়েক পাপ কাজ তা-ই বারবার চোখের সামনে জীবন্ত হয়। দাম না দিয়ে জেলের কাছ থেকে গলদা চিংড়ি নিয়ে আসা, লুট করে ফ্যান নিয়ে আসা, কান্দুপট্টিতে গমন প্রভৃতির কথা তার মনে পড়ে।

এছাড়াও কামালউদ্দিন '৭১ সালে দুই মুক্তিযোদ্ধাকে ঘরে আশ্রয় দেয়নি। ওই মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তার ছেলে সোবহানের বন্ধু। তারা টিকাটুলির ইলেকট্রিক 'টেরান্সফর্মার' উড়িয়ে দিয়েছিল এক কারফ্যুর রাতে। পরে তাদের আর কোন খবরাখবর পাওয়া যায়নি। কামালউদ্দিন অবশ্য অনুমান করে– 'হয়তো শহর ছেড়ে ওরা ঠিকই বেরিয়ে গিয়েছিলো। হয়তো আর কেউ জায়গা দিয়েছিলো। কিংবা পাঞ্জাবীদের হাতে ধরা পড়ে গেছে।' এতদিন পরে ছেলের সহযোদ্ধাদের অসহায় অবস্থায় আশ্রয় না দেওয়ার অপরাধবোধ কুরে কুরে দংশন করে বৃদ্ধ কামালউদ্দিনকে।

এই বৃদ্ধের যে অসুস্থতার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। যেমন—

একটি কাশির দমক আসে, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার দশা হলে বাম হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরে। বুকের কষ্টটা দমাবে কোন হাত দিয়ে ? সেখানে চিন চিন করে, আহারে, আল্লারে, এই দমটাই আমার শেষ দম কইরা দাও। কিন্তু প্রায় একসঙ্গে লুঙ্গির ভেতর একটা গরম কেঁচোর তরল গতি টের পায়, দেখতে দেখতে, ভিজে লুঙ্গি ঠাণ্ডা হলে কামালউদ্দিন বড়ো বিচলিত হয়। ঠাণ্ডা প্রবাহটি নেতিয়ে পড়া নুনু ও উরু গড়িয়ে পাছা ছড়িয়ে পড়লে তার ভয় হয়, পেচ্ছাবের সঙ্গে পায়খানা হলো না তো ? (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ৩০৭)

শারীরিক এ অসহায়তার যে নরক যন্ত্রণা তিলে তিলে ভোগ করে কামালউদ্দিন তার সঙ্গে যোগ হয় মানসিক যন্ত্রণা। ফেলে আসা দিনের স্মৃতি, স্বজন বিয়োগের যন্ত্রণা ইত্যাদি অসহ্যকর যন্ত্রণার মধ্যে তার চোখের সামনেই ছেলেরা সম্পত্তি নিয়ে যে অনাচার করে, বুনে চলে অশুভ বুদ্ধির জটাজাল তারও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে হয় এই মৃতপ্রায় বৃদ্ধকে।

বাইরে লোক দেখানো বাহবা কুড়ানোর জন্য কামালউদ্দিনের ছেলে আমজাদ মৃত ভাই আকবরের রুহের মাগফেরাতের জন্য আড়ম্বরপূর্ণ মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমজাদ, মৃত আকবরের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভিটা থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করে। এসব দুনিয়াদারীর অসহ্যকর পরিবেশে বৃদ্ধ কামালউদ্দিন ভোগ করে সীমাহীন নরক যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে বৃদ্ধ তাই মৃত্যুকে কামনা করে।

'দোজখের ওম' গল্পটি নানা কারণে বিশিষ্টতার দাবিদার। এই গল্পে পুরনো ঢাকার শব ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। মানুষের অন্তরের অতল প্রদেশে ভাবনার যে আস্তরণ তার শেষ তলানিটুকু খাদহীনভাবে ছেঁকে মেলে ধরা হয়েছে পাঠকের সামনে। মানুষের অসহায়তা, আর জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে স্মৃতির সঙ্গে সখ্য করে কিভাবে সে বেঁচে থাকে সংসারে তার অকৃত্রিম একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সহায় সম্পত্তির অশুভ মোহ কিভাবে মানুষকে কৌশলী করে অন্যদিকে প্রবঞ্চক বানায়, তার খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে এই গল্প উজ্জীবিত করে বেঁচে থাকার অভয় মন্ত্রে। তাই গল্পের শেষাংশে অসহায় কামালউদ্দিনের লাল বলকানো হুক্কায় পাঠক শুনতে পায়—"তর চাচারে কইস, দাদায় অহন তরি বাঁইচা আছে।" (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ৩১৮)

ইলিয়াসের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার অনুষ্টুপ প্রকাশনী থেকে। এ গ্রন্থে মোট পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে। এগুলো হলো— 'প্রেমের গপ্পো', 'ফোঁড়া', 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল', 'কান্না' ও 'রেইনকোট'।

সন্দেহপ্রবণ মানুষ ও মানুষের কল্পনাবিলাসিতা মূলত এ দু'টো বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'প্রেমের গপ্পো' গল্পটিতে। জাহাঙ্গীর ও বুলার দাম্পত্যজীবনের ওপর গড়ে উঠেছে এ গল্পের ভিত। বিশ বাইশ দিনের যে দাম্পত্যজীবন বুলা-জাহাঙ্গীরের তা মোটামুটি ভালই কাটছিলো গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে। স্বামীর প্রাক-বিয়ের প্রেমের গল্প খুব আগ্রহ সহকারে শুনতে থাকে বুলা। অন্যপক্ষে জাহাঙ্গীর, অন্তরের লালিত সাধ যা সে কল্পনা করতো অথচ কোনদিন সাধ্যে পরিণত হয়নি তাতে রং চড়িয়ে তা পরিবেশন করতো স্ত্রীর কাছে। নিজেকে কলেজের অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি হিসেবে জাহির করে জাহাঙ্গীর এক ধরনের পৌরুষত্বের সুখ অনুভব করে। গার্লস কলেজে পড়া স্ত্রীকে

যখন সে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে অবিশ্বাসের ঘুণ পোকা হয়ে তাদের সংসারে প্রবেশ করে বুলার বড় ভাই হাফিজের বন্ধু মুশতাক। মুশতাকের সাথে বুলার যে কোন প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল এমন নয়। বুলা ও মুশতাক দু'জনে ছেলেবেলায় সুনীল সেনগুপ্ত নামের জনৈক গানের মাস্টারের কাছে গান শিখতো। ওস্তাদের প্রতি শিষ্যের দরদ থাকতেই পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক বিশেষ করে ওস্তাদের চরম অসুস্থতার সময়ে। জানা যায়, সুনীল সেনগুপ্ত ভুগছেন দুরারোগ্য গলার ক্যান্সারে। স্ত্রীর সবটুকু ভালবাসা স্বামীর জন্য সঞ্চিত, এমনটি অনুমান করেছিল জাহাঙ্গীর। পরবর্তীকালে যখনি সে বুঝতে পারে স্ত্রী বুলার অন্তরে আরো কারো স্থান আছে তখন সে হঠাৎ হোঁচট খায়, মেনে নিতে পারে না। আর তাই অজানা গন্তব্যে 'ভেসপার চাকাজোড়া তার কেবল গড়িয়েই চলে।'

গল্পটিতে লেখক দাম্পত্য জীবনের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু গল্পকার গল্পের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন তা পুরোপুরি কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হয়নি। বিয়ের পূর্বে একটি মেয়ে গান শিখতেই পারে। এই গল্পে বুলা সুনীল সেনগুপ্ত নামের যে ব্যক্তির কাছে গান শিখেছেন সেখানে ছাত্রী-শিক্ষক সমবয়সী। আর বুলার এক সময়কার বন্ধু মুশতাকের সঙ্গে বুলার এমন কোন আচরণ জাহাঙ্গীর আবিষ্কার করতে পারেনি যা থেকে সন্দেহ তার অন্তরে মহীরুহ হয়ে উঠতে পারে। তবুও শেষপর্যন্ত জাহাঙ্গীর 'অন্য কোথাও, অন্য কোন খানে' শান্তির অন্বেষণে উদভ্রান্তের মতো ক্রমাগত ভেসপা চালায়। এখানে জাহাঙ্গীরের যে সন্দেহ তা আরোপিত। ফলে গল্পের শিল্পগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

'ফোঁড়া' গল্পে জীবন্ত হয়েছে মাকর্সীয় তত্ত্ব। মামুন নামের জনৈক পাটি কর্মী দায়িত্ব নিয়েছিল নইমুদ্দিন নামের কারখানার ছাঁটাই হওয়া এক অসুস্থ শ্রমিকের। একটা গোলমালের কারণে–

> গতমাসের বারো কি তেরো তারিখে নইমুদ্দিনের কারখানায় ছাঁটাই হলো, মামুনের পার্টি এর প্রতিবাদে স্ট্রাইক কল করলো পনেরো তারিখে। এই ডাকে সাড়া দিয়ে মিছিলের সঙ্গে মিল এলাকা থেকে বেরুবার সময় মালিকপক্ষের গুণ্ডার ডাণ্ডার বাড়িতে নইমুদ্দিনের মাথা ফাটল। ...পার্টির কর্মীদের নিয়ে মামুন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। অবস্থা যা হয়েছিল, আর পনেরো মিনিট দেরি হলে গুণ্ডারা তাকে গুম করে ফেলতে পারত। মালিক পক্ষ এমনকি ওকে নিজেদের কবজায় নিয়ে মামুনদের পার্টির নৃশংস আক্রমণের শিকার বলে খবরের কাগজে ওর ছবি পর্যন্ত ছাপিয়ে দিত। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ৩৪০)

নইমুদ্দিনকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর সে বেশ সুখেই ছিল। ঔষধ-পত্র, পরিচর্যা, নগদ টাকা এসব ব্যয়ভার বহন করছিলো মামুনের পার্টি। সমস্যা দেখা দেয় ঈদ আসাতে। ঈদের জন্য ডাক্তার যখন ছুটি নিয়ে বাড়ি গেল তখন ঐ একই পথ অনুসরণ করলো নইমুদ্দিন। তার এ রকম অসুস্থ শরীরে হঠাৎ বাড়ি যাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর হলেও সে ঈদে বাড়ি যায়। কারণ মামুন নগদ তাকে ১০০ টাকা দিয়েছিল। ১০০ টাকা নগদ হাতে পাওয়ার পর মিল কর্মচারীর খায়েশ জাগে পরিবারের সঙ্গে ঈদ করার। হাসপাতাল থেকে সে বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। মামুন এ খবর জানতো না। তাই ঈদের দিন বাড়ি থেকে সে খাবার নিয়ে যায় নইমুদ্দিনের জন্য হাসপাতালে।

নইমুদ্দিনের দেখা না পাওয়ায় খাবার ফিরিয়ে আনতে হবে বলে এই মৃতপ্রায় রোগীর হঠাৎ অন্তর্ধানে যখন সে বিরক্তি অনুভব করে তখনই সে সাক্ষাৎ পায় রিকশাওয়ালার। নইমুদ্দিন রিকশাওয়ালার মামাতো ভাই।

রিকশাওয়ালা মামাতো ভাইয়ের কাছে কয়েকটা টাকা হাওলাত চেয়েছিল। কারণ সে তখন ফোঁড়ার কারণে রিক্সা টানতে পারে না। কিন্তু মামাতো ভাই তাকে হাওলাত দেয়নি। তাই অসুস্থ শরীরে সে রিকশা নিয়ে বের হয়েছে। অনেক পরিশ্রমের পরও সে ঈদের খরচ জোগাড় করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল মহাজনের কাছে।

> মহাজন তাকে তিরিশ টাকা দিয়েছিল, মহাজনের রিক্সা চালিয়ে প্রত্যেকদিন ভাড়ার ওপর পাঁচ টাকা করে দেবে, এই ভাবে আট দিন দিলেই টাকা শোধ, সব ল্যাটা শেষ। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ৩৪৬)

প্রতিদিন ৫ টাকা করে ৮ দিন দিলে হয় ৫×৮ = ৪০ টাকা, ১০ টাকা যে অতিরিক্ত দিতে হবে তা হলো মহাজনের অসময়ের উপকারের প্রতিদান। কিন্তু টাকা দিয়ে কেনা দ্রব্যসামগ্রী সার্থক ভোগে লাগেনি রিকশাওয়ালার শেষ পর্যন্ত। আনাড়ি হাতে শেমাই রান্না করতে গিয়ে তার বৌ তা পরিণত করে আটার 'দলা'য়। একারণে তাকে স্বামীর হাতের 'ঠোনা' খেতে হয়েছে এবং খেতে হয়েছে সেই আটার 'দলা'। অন্যদিকে স্বামী ও সন্তান ঈদের আগের রাতেই খেয়ে নিয়েছে ভাত ও কৈ মাছের তরকারি এবং ঈদের দিন তাদের অবস্থা পূর্ববৎ।

গরিব নইমুদ্দিন ও রিকশাওয়ালার মধ্যেকার বণ্টন ব্যবস্থার চিত্র জীবন্ত করতে গিয়ে লেখক এই গল্পে ইঙ্গিতময়তায় যে ফোঁড়ার অনুষঙ্গ উপস্থাপন করেছেন সে বিষয়টাও চোখে পড়ার মতো। সমাজের অসম বণ্টন ব্যবস্থাকে লেখক তুলনা করেছেন ফোঁড়ার মধ্যে জমে থাকা যন্ত্রণাদায়ক পুঁজ হিসেবে। গল্পের শেষাংশে দেখা যায়, দরিদ্র রিকশাওয়ালা নিজের লাজলজ্জা ভুলে ফোঁড়ার পুঁজ বের করার জন্য ব্যস্ত। যদিও সব পুঁজ সে শেষপর্যন্ত বের করতে পেরেছে কিনা তা লেখক জানাননি পাঠকদের। তবু লেখক তাকে দিয়ে শুরু করিয়েছেন, আর এখানেই গল্পটা পেয়েছে প্রাতিস্বিক মাত্রা।

'৭১ থেকে '৯২, বাইশ বছরের ব্যবধান। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সমাজে, রাষ্ট্রে, ব্যক্তি জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল, প্রবহমান সময় স্রোতে আস্তে আস্তে সে পরিবর্তনে আসতে থাকে ভাটা। সুবিধাবাদীরা সাময়িকভাবে গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও আস্তে আস্তে তারা আবারও প্রসারিত করে তাদের কালো হাত। সুবিধাবাদীদের '৭১ সালের ভূমিকা, বর্বর পাক বাহিনীর নৃশংস অত্যাচার, নব্য সুবিধাবাদীদের উত্থান ইত্যাদি বিষয়ের পঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কখনো ইঙ্গিতে কখনো প্রত্যক্ষে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পে। পুরনো ঢাকাকে গল্পের ক্ষেত্র নির্বাচন করে গল্পকার '৭১ ও বর্তমান দু'সময়কে ফ্লাশ ব্যাক পদ্ধতিতে এক এক করে হাজির করেছেন পাঠকের সামনে। পাঠক 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পের মধ্যে দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারে '৭১ ও বর্তমানকে। তাই সব কিছু ছাপিয়ে সময়ই প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র হয়ে ওঠে এ গল্পের।

পুরানো ঢাকার দুই বন্ধু ইমামুদ্দিন ও লালমিয়া। একই সাথে কেটেছে তাদের বাল্যকাল। দুজনের মধ্যে লালমিয়ার চেহারা অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ার কারণে নাগরমহল সিনেমা হলের টিকেটমাস্টার তাকে বিনে টিকেটে সিনেমা দেখার সুযোগ দিত।

বিনে পয়সায় দেখা সস্তা সিনেমার গল্প করে এক রকমের আত্মতৃপ্তি অনুভব করতো লালমিয়া। অন্যদিকে মুখভরা বসন্তের দাগের কালো শরীরের ইমামুদ্দিন কাজ পায় প্রেসে। মহল্লার সব সুন্দরী মেয়েদের সে কল্পনায় আনতো, যাদের কাছে পাওয়ার সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। তাই কল্পনায় তাদের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার গল্পজাল অন্তরে বুনে তা অন্যের কাছে মেলে ধরে এক ধরনের আত্মসুখ অনুভব করতো ইমামুদ্দিন।

দুই নিম্নবিত্ত তরুণের এহেন কল্পনাবিলাসী আত্মসুখের মধ্যে হঠাৎ বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। আর তখনই দু'জনে ছিটকে পড়ে দু'দিকে। ইমামুদ্দিন চলে যায় মুক্তিযুদ্ধে। অন্যদিকে লালমিয়া থেকে যায় রাজাকার নাজির আলির জবর দখল করা লণ্ড্রির দোকানে। যে দোকান সে দখল করতে পেরেছিল কার্তিক বাবুকে মিলিটারিরা মেরে ফেলার পর। ইমামুদ্দিন চেষ্টা করে লালমিয়াকে মুক্তিফৌজ বানাতে। কিন্তু সিনেমা হলের ম্যানেজারকে দেহ দিয়ে যে তরুণ ফ্রি সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত সে সাহস পায় না যুদ্ধে যেতে। বরং যুদ্ধের বিপক্ষে তার অবস্থান।

ইমামুদ্দিন তবু বুঝিয়েছে লালমিয়াকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, গালাগালি করেছে তার মহাজন নাজির আলিকে। একদিকে মিলিটারির সঙ্গে সখ্য করা মহাজনের সাথে থেকে নিশ্চিন্তে দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া অন্যদিকে বন্ধুর আহ্বান এ দুইয়ের দ্বন্দ্বে পড়ে লালমিয়া। শেষ পর্যন্ত সে অনিশ্চিত জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে থেকে যায় রাজাকার নাজির আলির সাথে নিশ্চিত জীবনে। এজন্য বন্ধু ইমামুদ্দিনের ভর্ৎসনা মাখা গালিগালাজ তাকে কম শুনতে হয় না।

ইমামুদ্দিন আর ফিরে আসে না। বরং নাজির আলির সাহায্য নিয়ে মিলিটারিরা খুঁজে পায় লালমিয়াকে এবং মিলিটারির গাড়িতে উঠে লালমিয়াকেই যেতে হয় ইমামুদ্দিনের বস্তি চেনাতে। বস্তিতে পৌঁছানোর পর মিলিটারিরা যে নৃশংস অত্যাচার করে তার সরল বর্ণনা ইলিয়াস যেভাবে পাঠককে দিয়েছেন তাতে তিনি সময় খুঁড়ে হাজির করেছেন জীবন্ত এক '৭১কে। লেখকের বর্ণনা–

> বস্তি ঘেরাও করে রাইফেল, এস.এম.জি এবং কয়েকটি গ্রেনেড পাওয়া গেল। ঐ ঘরের লোকজন সব আগেই হাওয়া, তাদের ধরতে না পেরে বস্তির যাবতীয় মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি ও শিশুদের একচোট বানানো হলো। ইমামুদ্দিনের ১২/১৩ বছরের ভাই ও ইমামুদ্দিনের বাপকে আচ্ছাসে জখম করা হয়েছিল, তাদের তোলা হলো মিলিটারির লরিতে। মারধোর ও ধরাধরির কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে মিলিটারি এবার বস্তিতে আগুন ধরিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করল। তাদের যাবতীয় তৎপরতার মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহ এই আগুন লাগা ঘরের দিকে টার্গেট করে ব্রাশ ফায়ারের কাজে। হাজার হলেও দুনিয়ার সেরা ফৌজ, হাতিয়ারের ট্রিগার টেপার চেয়ে তাদের বড়ো সুখ আর কীসে থাকবে? ব্রাশ ফায়ারের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে সংগত করে বেজে ওঠে ইমামুদ্দিনের খুনখুনে বুড়ি দাদীর খনখনে গলা। 'আল্লায় সইজ্য করব না, সইজ্য করব না। তগো উপরে গজব পড়বো, গজব পড়বো!' ... 'এই কুত্তার বাচ্চা, খানকির বাচ্চা নাজিরা আউজকা মিলিটারির ভাউরা হইয়া আজরাইলগো লইয়া মহল্লার মইদ্যে ঢুকচে। আমাগো ব্যাকটিরে ধরাইয়া দিতে আইচে। আরে ভাউরার ভাউরা, মিলিটারি দিয়া তর মায়েরে চোদা, তর বুইনেরে চোদা।' (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ৩৬১-৬২)

মিলিটারিদের অত্যাচারের সময় ইমামুদ্দিনের বস্তিবাসি বুড়ি দাদি যেভাবে আঞ্চলিক শব্দচয়নের মাধ্যমে গালিগালাজ করেছে তাতে জীবন্ত হয়েছে একদিকে বর্বর বাহিনীর প্রতি তীব্র ঘৃণা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্তান্ত।

ইলিয়াসের 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পটি কয়েকটি কারণে বিশিষ্টতার দাবিদার। এতে ফুটে উঠেছে '৭১ সালের পাক সেনাদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী। সুবিধাবাদীরা কিভাবে সুবিধার ফায়দা লুটে নিয়েছে তার একটা সূক্ষ্ম খতিয়ান। সাময়িক আত্মগোপনের পর পরাজিত শক্তি আবারো নতুন বেশে কিভাবে তাদের আধিপত্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে তার বর্ণনা। কিন্তু এসব কিছু ছাপিয়ে যে বিষয়টা এই গল্পের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা তা হলো– 'আদর্শ অমর' এই শাশ্বত বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা।

ইমামুদ্দিনের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হলেও তার ছেলে মোহাম্মদ কাসেম ওরফে বুলেট বেঁচে থাকে। প্রকাশ্যে সে দেখে সফেদ দাড়ির নাজির আলিকে। ধর্মের লেবাস পরে নাজির আলি সমাজের এখন বিত্তশালী এক মান্য ব্যক্তি। প্রকাশ্যে তার মোকাবেলা করতে পারে না বুলেট। তাই সে ঘুমের মধ্যে সাদা দাড়ির 'দুধের নহর বইয়ে দেওয়া ঘিয়ে রঙের আলখাল্লাওয়ালার ওলটানো পায়ের পাতা' লক্ষ করে বুলেটের মতো তীব্র বেগে প্রস্রাব করে দেয়। বুলেটের এই তীব্র ঘৃণা শেষ পর্যন্ত ইলিয়াসের দক্ষ লেখনীর গুণে একজনের প্রতিবাদ হিসেবে থাকে না বরং পাঠক একাত্ম হয়ে যায় এই কিশোরের সঙ্গে। তারা চিনতে পারে পরাজিত শক্তিকে এবং উজ্জীবিত হয় ঘৃণ্য রাজাকারদের দিকে তাক করে ঘৃণার মন্ত্র উচ্চারণ করতে। আর এখানেই গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সার্থক শিল্পী।

'কান্না' গল্পটিতে লেখক ইলিয়াস ডুব দিয়েছেন মানুষের অন্তরাত্মার একেবারে গহীন প্রদেশে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ভাবনার শাখা-প্রশাখা। সে ভাবনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমাজব্যবস্থার চলমান বাস্তব চিত্র।

মিলাদ পড়ে, মোনাজাত করে, মুর্দাদের কবরের নানা কাজকর্মের তদারকি করে আফাজ আলি ঢাকা শহরের আজিমপুর গোরস্থানের খাদিমদার হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছে। গোরস্থানে হাজারো ঝক্কি-ঝামেলার মধ্যে থাকতে হয় তাকে। মুর্দাদের আত্মীয়রা যা ফরমায়েশ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে গিয়ে নানা রকম অসুবিধায় পড়তে হয় আফাজ আলিকে। এর মধ্যে মুর্দাদের আত্মীয়-স্বজনরা আবার হাজির হয় না সময়মতো। ফলে কিভাবে লোকসান পুষিয়ে নেওয়া যাবে সে চিন্তাটাও রাখতে হয় মাথার মধ্যে। এ রকমের এক ব্যস্ত দিনে যখন আফাজ আলি ব্যস্ত কবর জিয়ারতে, তখন সেখানে উপস্থিত হয় কৃষ্ণকাঠির কুদ্দুস হাওলাদারের ছেলে মনুমিঞা। মোনাজাতের মধ্যে আফাজ আলি মনুমিঞাকে এক নজর দেখে বটে তবে তার দিকে পুরো নজর দেয় না। কারণ আফাজ আলির ছেলের চাকরির ঘুস নেওয়ার জন্য মনুমিঞা কয়েকবার ঢাকায় হাঁটাহাঁটি করেছে। আলতো নজরে আফাজ আলি মনুমিঞাকে দেখার পর তার দোয়ার মধ্যেও অন্তরে ভিড় করে ছেলের চিন্তা। তাই মোনাজাতের একস্থানে মুর্দার নাম হায়াৎ হোসেন খানের পরিবর্তে নিজের ছেলের নাম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ উচ্চারিত হয়ে যায়।

পরে আফাজ আলি মনুমিঞার কাছ থেকে জানতে পারে, হাবিবুল্লাহর চাকরির ঘুসের টাকা নিতে সে ঢাকায় আসেনি। সে বহন করে এনেছে হাবিবুল্লাহর পাতলা দাস্তের খবর। ছেলের দাস্তের খবরের জন্য মনুমিঞাকে ঢাকা পর্যন্ত আসতে হয়েছে তা বিশ্বাস হয় না আফাজ আলির। কারণ ছেলের চাকরির জন্য ঘুসের টাকা বাবদ কুদ্দুস হাওলাদারের কাছ থেকে যে ৫,০০০/= টাকা হাওলাত করা হয়েছে তার কিছু অংশ জোগাড় করতে হবে এই শবেবরাতে, গোরস্থান থেকে। অথচ ছেলের দাস্তের এ তুচ্ছ খবরে তাকে যেতে হবে বাড়িতে।

সামনে শবেবরাত থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আফাজ আলি ছেলের মরমর অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ গ্রাম বাকেরগঞ্জ যায় এবং ছেলের কবর দেখতে পায়। ঢাকায় গোর তদারককারী আফাজ আলি গ্রামের গোর দেখে হতাশায় ভেঙে পড়ে। ঢাকা শহরে যাদের গোর তদারক করে আফাজ আলি, বলতে গেলে, তারা প্রায় সবাই তার অপরিচিত। অথচ তারই তত্ত্বাবধানে কী পরিষ্কার করেই না রাখা সে সব কবর। অন্যদিকে নিজের ছেলে যেখানে শুয়ে আছে সে স্থানটা–

> এ কী গোরস্থান না ভাগাড়? এ সব কি মুর্দাকে ইজ্জতের সঙ্গে দাফন করা, নাকি লাশ দড়ি বেঁধে টেনে এনে পুঁতে রাখা হয়েছে? খালের ধারে বেতবন থেকে মানুষের ও বাঁশঝাড় থেকে পর্দানশিন মেয়েমানুষের গুয়ের গন্ধ, রাত্রে শেয়ালের খোঁড়া কবরগুলো থেকে উঁকি দেওয়া বয়স, লিঙ্গ ও পেশা নির্বিশেষে মুর্দাদের খুচরা-খাচরা ঠ্যাং বা হাঁটুর গন্ধ, গিজগিজ করা গাছপালা-লতাগুলোর ভেষজগন্ধ মিশে ফাল্গুনের ফুরফুরে হাওয়া অবিরাম ঘুরপাক খায়। দুষ্টুমি করে এর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নদীপথ হয়ে খালের পানিতে ভেসে-আসা নোনা বাতাসের ঝাপটা। (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ৩৮৬-৭)

ছেলের মৃত্যুচিন্তা খুব বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না আফাজ আলিকে। বরং সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছেলে হাবিবুল্লাহর চাকরির জন্য ঋণ করে যে ৫০০০/= টাকা অগ্রিম ঘুষ দেওয়া হয়েছিল তা ফেরত আনা যায় কিনা, সে চিন্তায়। ঘুস বাবদ প্রদেয় টাকা উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হলে সে আবারো ফিরে আসে পুরনো কর্মস্থলে, ঢাকা শহরের আজিমপুর গোরস্থানে। এখানে সদ্যমৃত এক জোয়ান ছেলের জন্য দোয়া করতে হাত উঠিয়ে বারবারই তার অন্তরে ফিরে আসে মৃত ছেলে হাবিবুল্লাহ। তাই শাহতাব কবির আর হাবিবুল্লাহ একাকার হয়ে দোয়ার মধ্যে জীবন্ত হয় আফাজ আলিরই করুণ কান্না।

সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত লেখক এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন সন্তর্পণে। 'কান্না' গল্পে তিনজন কলেজ শিক্ষকের বিবরণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে নামহীন একজন 'কলেজ মাস্টার' যে বাঁকা করে নীতিকথা উচ্চারণ করে। ব্যক্তিজীবনে সে ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে লেখক বলেননি কিছু। অন্য দু'জনের পরিচয় দিতে গিয়ে আফাজ আলির চিন্তার মাধ্যমে লেখকের বর্ণনা-

> হাবিবুল্লাহকে সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করিয়ে দিতে ঘুষ নিল যে লোকটা, দবিরুদ্দিন না কবিরুদ্দিন মোল্লা, সেও তো কোন কলেজের মাস্টারই ছিল। আবার মনুমিঞার সঙ্গে গিয়ে আফাজ আলি ছেলের চাকরির জন্য ১ম কিস্তি ঘুষ দিয়ে এল, জাহাঙ্গীর কাজী,—সে লোকটিও তো বরিশাল না খুলনা না যশোর কলেজের প্রফেসর, কী একটা অফিসার পোস্টে বদলি হয়ে এসেছে—'২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী শিক্ষা বিস্তার প্রকল্প' অফিসে। এখানে যতদিন থাকে

> দুই হাতে টাকা কামাবে, তারপর সরকারের মর্জিমতো কোথায় কোনো কলেজে ঠেলে পাঠাবে, আবার সেই মাস্টার তো মাস্টারই! (রচনাসমগ্র-১, পৃ. ৩৮১)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'কান্না' গল্পটি বাংলা ছোটগল্পে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এতে একদিকে যেমন মনস্তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে ঠিক তারই পাশাপাশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সমাজের ক্রমক্ষয়িষ্ণু নানা চিত্র। সেই সাথে গ্রাম ও শহর একাকার হয়ে গড়ে উঠেছে একটা ছবি। যে ছবির দুটো সত্তা দূরে দাঁড়িয়ে আলাদাভাবে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতের আঁধারে অতর্কিত হামলা চালানোর পর নয় মাস যাবৎ বর্বর পাকবাহিনী সীমাহীন অত্যাচার চালায় এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর। একদিকে সে অত্যাচারের শিকার হয়েছিল এদেশের গ্রামের সাধারণ কৃষক থেকে উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য যে মুহূর্তে একদল মানুষ সংঘবদ্ধ আন্দোলনে রত, ঠিক সেই মুহূর্তে তারই বিপরীতে ক্ষমতার চেয়ার আঁকড়ে থাকার জন্য কিছু উচ্চশিক্ষিত মানুষ নাম লেখায় দালালের খাতায়। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ও বিপক্ষের কয়েকটি চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পে। এ গল্পের রচনাকাল ১৯৯৫ সাল। ততদিনে মুক্তিযুদ্ধের সিকি শতাব্দী অতিক্রান্ত। মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতিই মানুষের কাছে অন্তর থিতুনি। সেই সময়ে ইলিয়াস 'রেইনকোট' লিখে আবারো হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি পাঠকের সামনে হাজির করলেন বিস্মৃতির গহ্বর থেকে।

কয়েকজন কলেজ শিক্ষকের ভূমিকা '৭১ সালে কী রকম ছিল মূলত সে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক 'রেইনকোট' গল্পে মূর্ত করেছেন '৭১এর চিত্র। ঢাকা কলেজে কর্মরত কেমিস্ট্রির লেকচারার নুরুল হুদা এক সকালে প্রিন্সিপাল ড. আফাজ আহমদ-এর সালাম পায়। জোড়া দেওয়া বাংলা-উর্দুতে প্রিন্সিপালের সালাম পৌঁছে দিয়ে পিয়ন ইসহাক তড়িঘড়ি বের হয়ে যায় তার ঘর থেকে। যুদ্ধের সময় বাংলার সঙ্গে উর্দুর মিশেল ভালভাবে দিতে পারার কারণে পিয়ন 'ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারীর কর্নেল বললেও চলে'। নুরুল হুদা যখন প্রিন্সিপালের সালামের জবাব দেওয়ার জন্য বাইরে বের হতে উদ্যত তখন সে পড়ে সমস্যায়। কারণ সেই সময়ে বাইরে একনাগাড়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। নুরুল হুদার যে হাঁপানি রোগ আছে অসময়ে বৃষ্টিতে ভিজলে তা বাড়ার আশঙ্কা বেশি। হাঁপানির কথাটা তাঁর স্ত্রী একবার স্মরণ করিয়েও দেয়। কিন্তু বৌয়ের কথা ছাপিয়ে তখন নুরুল হুদার অন্তরে জীবন্ত প্রিন্সিপালের চেহারা।

প্রিন্সিপালের সালামের জবাবে সাড়া না-দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি কী হতে পারে তা আঁচ করতে পেরে নুরুল হুদা বেরিয়ে পড়েন বৃষ্টির মধ্যেই। বৃষ্টি থেকে গা বাঁচানোর জন্য তিনি শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটা গায়ে জড়িয়ে নেন। মিন্টু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। মিন্টুর রেইনকোট গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার পর নুরুল হুদার অন্তরে আনাগোনা করে নানা ভাবনা। সে ভাবনার মধ্যে বারবারই ঘুরে ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ।

ভাবনাগুলো সাথে নিয়ে একসময় নুরুল হুদা হাজির হন প্রিন্সিপালের চেম্বারে। সেখানে তিনি খান সেনাদের একজন জাঁদরেল অফিসারের উপস্থিতি দেখতে পান। আরো পরে মিলিটারি ক্যাম্পে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় নানা প্রশ্ন। তিনি প্রশ্নগুলোর যথাযথ জবাবও দেন। এক পর্যায়ে তিনি জানতে পারেন মিসক্রিয়েন্টরা তার নাম বলেছে মিলিটারিদের কাছে। মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে আলমারি সরবরাহ করার জন্য কুলির বেশে কলেজে ঢুকেছিল। সকাল থেকে যে ভয় অন্তরে বাসা বেঁধেছিল নুরুল হুদার তা সাফ হয়ে আস্তে আস্তে সেখানে গজিয়ে ওঠে সাহস আর গর্বের তরতাজা সবুজ বৃক্ষ। তিনি হয়ে যান স্বাধীনতার সপক্ষের এক অকুতোভয় বীর সেনানী। মিলিটারির অত্যাচারের আবর্জনা স্তূপে নুরুল হুদা নতুন করে জন্ম নেন ঝলমলে পদ্ম হয়ে।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর অনেক সাহিত্যই রচিত হয়েছে এদেশে, কিন্তু ইলিয়াস যেভাবে 'রেইনকোট' গল্পে আপসকামী ও আপসহীন মানুষের চরিত্র চিত্রণ করেছেন ও বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন '৭১ সালের চিত্র তাতে গল্পটি হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের এক জীবন্ত দলিল। গল্পের শেষে শারীরিক নির্যাতনের মধ্যেও নুরুল হুদার আপসহীনতা পাঠকদের শেখায় সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকার অকুতোভয় মন্ত্র।

ছোটগল্পের নির্দিষ্ট ছকে ইলিয়াসের গল্প সবসময় সীমাবদ্ধ থাকে নি। তা বারবারই বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বহুমুখী হয়েছে একথা ঠিক, তবুও "অপরিসীম ধৈর্য, দারুণ মনোযোগ ও তছনছ করা চাহনি দিয়ে গল্পে তিনি চরিত্রের ময়না তদন্ত করেন। চরিত্রকে টুকরোও করেন। হুড় হুড় করে ব্যক্তির মধ্য থেকে তখন বেরিয়ে আসে কালোদাগ বালি-ময়লা এবং অতৃপ্ত কামনা বাসনা। ...আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প মানে নতুন স্বর সুর, নতুন আস্বাদ। মনে হবে স্বাভাবিক চোখজোড়া ছাড়াও মাথার পেছনে দুটি এবং করোটির উপরে মোট পাঁচটি চোখ দিয়ে সবকিছু অবলোকন করে লেখক গল্প লিখছেন। তার গল্পে কথা তাই অনেক। সদরের দরজা পার হয়ে অন্দরের দরজা, সেটা পার হয়ে আরো গুপ্ত ঘরে লেখক পাঠককে নিয়ে যাচ্ছেন। গল্পের ভেতরের গল্প ধরে যেখানেই যাওয়া যাক তা বাস্তব, মানুষের জীবন থেকে ছিঁড়ে কিছুতেই আলাদা হওয়ার নয়"।[১২] তাঁর গল্পে আছে ভাঙাগড়া। আপাতভাবে মনে হতে পারে প্রচলিত রীতি নীতি সবকিছু ভেঙেচুরে তিনি একাকার করতে চেয়েছেন। কিন্তু সতর্ক চোখে তাকালে বোঝা যাবে, তিনি আশা যুগিয়েছেন আবার নতুন করে শুরু করার। "বিশ্বাস ভেঙে যাবার পরে, চুরমার ভাঙচুরের পরে, কঠিন অন্বেষণের পরে, মানব সমাজ ও মানুষকে বীক্ষণের পরে, ইতিহাসের ধারায় চলতে চলতে, হারানো বিশ্বাস ফিরে পেতে পেতে—অন্য সব বই লিখতে লিখতে, মানুষের রক্তঝরা দেখতে দেখতে—একটা দুঃসহ কঠিন পথে ইলিয়াস সমস্ত কাঠামো মাটিতে সমান করে দেবার পরে নতুন চোখে মানুষের দিকে চেয়ে কি বিশাল পুনর্নির্মাণের কাজ করতে নেমেছেন তা আমাদের আশ্চর্য করে।"[১৩] জীবন বাস্তবতার রূপায়ণে এ শিল্পী যেভাবে সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র তুলে আনতে পেরেছেন তাতে তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃত একজন দিকপাল।

## তথ্যনির্দেশ


১. সুশান্ত মজুমদার, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দ্বৈরথ সময়', *আজকের কাগজ,* ঢাকা, ১৫-০৮-১৯৯১

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প', *সাহিত্য পত্রিকা,* ৩৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৯৯, পৃ. ২১৫

৩. হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ', *কথাসাহিত্যের কথকতা,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৭৪-৭৫

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৫. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য,* ১ম সং, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৪৮২

৬. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১০৩

৭. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৩

৮. এজাজ ইউসুফী, 'চন্দ্রলোকের হন্তারক, মানবিক বোধের যুগলবন্দি', *লিরিক,* চট্টগ্রাম, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ১১৮

৯. সুশান্ত মজুমদার, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দ্বৈরথ সমর', *লিরিক,* আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৯৯২, পৃ. ৮৩-৮৪

১০. শামসুজ্জামান খান, 'স্বাধীনতা দিবস ভাবনা', *সংবাদ,* ২৬ মার্চ ১৯৯২

১১. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০১

১২. সুশান্ত মজুমদার, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প নতুন স্বর, সুর ও আস্বাদ', *শৈলী,* ২:২২, ১ জানুয়ারি ১৯৯৭, ঢাকা ,পৃ. ৩০-৩৫

১৩. হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষের অমৃতফল', *শৈলী,* ২:২২, ১ জানুয়ারি ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ১৫